মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

মণি বাগচি

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৬১
কার্তিক ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯ এ, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

যাঁর মধ্যে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক
এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের
সমাবেশ ঘটেছিল, সেই মহাসমন্বয়াচার্য
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
পুণ্য স্মৃতিতে।

গৌরাঙ্গ স্তব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত, একাকার,
দুর্নিবার প্রেমে—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে,
আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপধামে···
এই কূট তর্কের আবর্তে এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা ভক্তির মহতী
দুর্দাম বন্যার মত পড়িল আসিয়া
ভৈরব মধুর স্বনে—দিল ভাসাইয়া
ভাঙিয়া বিচূর্ণ করি নিয়ম আচার
সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণ বিকম্পিত বক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত, আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব
নবযৌবনের মত কোথা হতে নেমে,
অমনি উঠিল নৃত্য মহানৃত্য প্রেমে,
আর সেই সংকীর্তন মধুর মৃদঙ্গে
সুমধুর হরিনাম ছাইল এ-বঙ্গে।[১]

শ্রীচৈতন্যদেব

স্বামী বিবেকানন্দ

অপেক্ষাকৃত আধুনিক আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার শিক্ষাষ্টকের মধ্যে একটি এইরূপ :

ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতুভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ, 'হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না ; হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম। মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ হইতে। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার নবদ্বীপের এক খুব পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি ন্যায়ের অদ্বিতীয় অধ্যাপক হইয়া বাগ্‌যুদ্ধে লোককে পরাস্ত করিতেন। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। ইহাই তিনি অতি বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন এই প্রেমোন্মাদ চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল, সকলকেই তিনি দয়া করিতেন। তাঁহার হৃদয় ছিল বিশাল। তাইত তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, অকাতরে প্রেমভক্তিরূপ সম্পদ বিলাইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় মহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ত্যাগে, প্রেমে ও ভক্তিতে এই চরিত্র অতুলনীয় এবং সর্বকালের নমস্য।

॥ ভূমিকা ॥

'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি হাতে আসিল। পরমানন্দে পাঠ করিলাম। চিরসুন্দর মানুষটির নিত্য নবায়মান সুন্দর কথা, পরম চিত্তাকর্ষী ভাষায় লেখক বলিয়াছেন—সহজ কথা সরল কথা সর্বজনবোধগম্য, পড়িতে বসিলে ছাড়া যায় না। মহাপ্রভুর মধুময় জীবনলীলার তিন ভাগ। প্রথমে নদীয়ালীলা বা গার্হস্থ্যলীলা, অন্তে নীলাচললীলা বা সন্ন্যাসলীলা, মধ্যে ভারত-পরিক্রমা লীলা—দক্ষিণ দেশ ও কাশী প্রয়াগ-বৃন্দাবনে। সন্ন্যাসলীলায় প্রভু অলৌকিক পুরুষ, অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত, জনসাধারণ হইতে উর্ধ্বে। নদীয়া-লীলায় শচীর নিমাই সহজ সরল সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনচিত্তাকর্ষী, সকলের একজন প্রাণের মানুষ। বাল্যের মধুর চাপল্য, কৈশোরের শাস্ত্রবিচার নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য গ্রন্থকার সরস সাবলীল বর্ণনায় মনোহারী করিয়া ফুটাইয়াছেন।

শচীমাতার সঙ্গে সহাধ্যায়ী রঘুনাথ, মুরারী গুপ্ত, মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গের তপন মিশ্রের সঙ্গে প্রভুর মাধুর্যময় কথাবার্তা ও অমায়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রভুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন ও নূতন লীলার সূত্রপাত পরম উপাদেয়। এসব কথা কতবার পড়িয়াছি, এই গ্রন্থে আবার নূতন করিয়া পড়িলাম। নদীয়ার প্রাণের ঠাকুরটিকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতে পারিলেই পুরাতন কথাগুলিকে এত সুন্দর করিয়া বলা যায়। সেই ভালবাসার সম্পদ গ্রন্থকারের আছে।

গ্রন্থের প্রথমভাগে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রণিধান-যোগ্য। ধর্মের গ্লানি হইলে গোলোকবিহারী মর্ত্তে অবতরণ করেন। এই কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কোথায় কি জাতীয় গ্লানি হইয়াছিল ও যুগপুরুষ তাহা কিভাবে অপনোদন করিয়াছিলেন, সনাতন ধর্মকে কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিপূর্ণভাবে বর্ণনা করিতে কৃপাপুটিত স্বচ্ছদৃষ্টির প্রয়োজন। গ্রন্থকারের তাহা আছে।

'জয় নবদ্বীপ, ভারত প্রদীপ।' নবদ্বীপচন্দ্রের লীলাকে প্রভু জগবন্ধু বর্তমান তমসাচ্ছন্ন ভারতীয় কৃষ্টির সমুজ্জ্বলকারী প্রদীপস্বরূপ বলিয়াছেন। এই প্রদীপটিকে যে লেখক যত উঁচু ও ব্যাপক করিয়া তুলিতে পারিবেন তিনি ততখানি ভারতীয় সংস্কৃতির জীবনীশক্তিকে সুপ্রকাশিত করিতে পারিবেন। ভূমাপুরুষ ভূমির মাটিতে

অবতরণ করিয়াছিলেন। আর পাঁচ বছর কাটিলেই তাঁহার আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পূর্ণ হইবে। এই কথা স্মরণ পথে লইয়াই জাতীয় জীবনীকার শ্রীবাগচি মহোদয় এই গ্রন্থ-মালিকাটি গ্রন্থন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিণত প্রতিভার এই প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা গৌরপ্রদীপচ্ছটায় চিরজয়যুক্ত হউক।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

॥ নিবেদন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের পাঁচশত বর্ষ পূর্ণ হতে বিলম্ব নেই। বাঙালীর জীবনে এটি নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থের অপ্রতুলতা নেই। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি আকর গ্রন্থে তাঁর লীলা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে তাঁর দর্শনচিন্তা ও ধর্মশিক্ষা। বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে মহাপ্রভুর অবদানের মূল্যায়ন অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত করেছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন একটি বহু অনুশীলিত জীবন। তাঁর লীলা গ্রন্থের অভাব নেই। তবে কেন এই দুঃসাহস? এর উত্তর একটিই আছে:

আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলা-সিন্ধুর এক বিন্দু ছুঁইতে নারিনু॥

ষোড়শ শতকের বাংলার সমাজ একজন পূর্ণ পুরুষের আবির্ভাবের জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সকলের অন্তর-নিঙড়ানো আর্তির মূর্তি প্রকট হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে। মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী পৃথিবীর মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে ডেকে বলবার মতো কাহিনী। এ কাহিনী কখনো পুরাতন হয় না। ভারতের প্রদীপ একদিন জ্বলেছিল নবদ্বীপে। আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনার দিনে সেই প্রদীপটিকে তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে। সেই সর্বপূর্ণতার মূর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সুপণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এই বইটির জন্য একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

মণি বাগচি

॥ এক ॥

লীলা পুরুষোত্তম মহাপ্রভুর পুণ্য আবির্ভাবের চিত্রপটটি আগে তুলে ধরি।

তাঁর আবির্ভাব বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ঐহিক পার্থিব শিক্ষাই ছিল তখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুকৃষ্টি ছিল তখন সন্দিগ্ধ। এই অবস্থা শুধু রাজনৈতিক অত্যাচার ও বিরোধিতার ফলে ঘটেনি। সমকালীন অবস্থায় হিন্দু সমাজ-দেহে অনেক দোষ ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছিল। সেই সংকটাপন্ন অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দী এক সংকটময় যুগের ইতিহাস। ইউরোপে তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে এসেছে—নতুন যুগের সূচনা। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে। তার এক বছর পরে—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তখন সমগ্র ভারতে হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত প্রায়। বাংলার সিংহাসনে বাদশা হুসেন শা। মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা। নবদ্বীপ বিদ্যা ও সাহিত্য-সাধনার প্রধানতম নগর। লোক সাধারণ বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ধর্ম জানতো। বেদকে মনে করতো কেবল ধর্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র—তাদের কাছে নিরীশ্বর কর্মবাদ বৈদিক মত বলে গৃহীত হতো।

বিপ্রগণ সবাই জড়বাদী। সামান্য যজ্ঞকর্ম সমাধা করে, ঐহিক সুখলাভকেই একান্ত কাম্য বলে মনে করতেন তাঁরা। মরণান্তে স্বর্গ-লোকের অপ্সরা ও অমৃত দুইই তাঁরা লাভ করবেন—এমন বিশ্বাসও

ছিল তাঁদের। অধ্যাপকদের অভিমান ছিল তাঁরা শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম-পরায়ণ। আসলে তাঁরা অজ্ঞ ও নাস্তিক হয়েছিলেন। আর তার্কিকদের তর্কের দাপটে বেদ ও বৈদিক ঈশ্বর পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, অবন্তীপুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি ব্যভিচার-স্রোতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

নবদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কল্পনাতীত সচ্ছল। অর্থ ও সম্পদের মধ্যে বাস করেও স্বেচ্ছাচারী রাজার ভয়ে ধন, রত্ন, স্ত্রী ও মান-সম্ভ্রম যে কখন নষ্ট হবে এই ভয়ে কেউ সুখে নিদ্রা যেতে পারত না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজগতের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। বাংলাদেশ ছিল অরাজকতার রঙ্গভূমি। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পর সেনরাজ-যুগে নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থান। সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রম ধর্ম পক্ষঘাতগ্রস্ত। একদিকে সামাজিক দুর্নীতি, অন্য দিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য-স্বাতন্ত্র্যতার কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের কৃত্রিমতা, শুষ্কজ্ঞান, চিন্তার সংকীর্ণতা, ধর্মমতের অস্বাভাবিকতা এবং বর্ণবিদ্বেষ বাঙালীকে পীড়িত করে তুলেছিল। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরির মতো সমস্ত বাংলা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

পাঠান রাজশক্তি তখন ক্রমবর্ধমান। তার অভিযানে ও সংঘর্ষে এই সময় একটা প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব হওয়ার কথা। অধর্ম বৃদ্ধির ফলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষার প্রচণ্ড দহনের ভীষণ জ্বালায় বাঙালী হিন্দু সমাজ, হিন্দু আদর্শ ও হিন্দুধর্ম তখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল না। অদ্বৈত আচার্যের সাধনায় এবং আকুল আহ্বানে ভগবান এই শ্যাম বাংলার মাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই আবির্ভাব ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল। একে কেন্দ্র করে বাঙালীর অন্তর পুরুষের যে জাগরণ সেদিন ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল গৌড়ীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও রসশাস্ত্রের অভাবনীয় সমৃদ্ধিলাভ।

এ হেন দুর্দিনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ধর্মের গ্লানিকে দূর করে নানাবিধ মতবাদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবের বাণী প্রচার করলেন। স্থাপন করলেন

যুগধর্ম আর দীক্ষিত করলেন স্বজাতিকে সংহত ঐক্যবদ্ধ মানবতার ধর্মে। অন্যদিকে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরগণের জন্য প্রবর্তন করলেন পরতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ—অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। সাধারণ জনগণের জন্য ব্যবস্থা দিলেন যুগধর্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। এই সংকীর্তনযজ্ঞের ভেতর দিয়েই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষ পেয়েছিল পরমার্থের অধিকার। ডুবে গেল বাঙালীর মন মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমভক্তির অমৃত প্লাবনে।

উথলিল প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥

মানুষের সঙ্গে আর মানুষের ভেদ রইল না। এক অভিনব রস-প্লাবনে সমস্ত বাংলা প্লাবিত হয়ে গেল। দুর্গম ধর্মের পথ সুগম হয়ে গেল। দুষ্কর তপস্যালব্ধ ভগবান্ মানুষের কাছে অতি সহজেই ধরা দিলেন। বাংলা বাঁচল, বাঙালী বাঁচল।

অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন অসহযোগের মন্ত্র বাঙালী তাঁরই কণ্ঠে প্রথম শুনেছিল। রাজশক্তির সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের সংঘর্ষ হলো। প্রথমে নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নদীয়ার শাসনকর্তা চাঁদকাজী। শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনের খোল ভেঙে দিলেন। হুকুম দিলেন যদি কেউ সংকীর্তন করে তাকে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হবে। মহাপ্রভু এই আদেশ মানলেন না। নির্দেশ দিলেন জনগণকে নাম-কীর্তন বর্জনের আদেশ অমান্য করতে। শুধু অমান্য করা নয়, সেজন্য অকাতরে নিগ্রহ ভোগ করা। তাঁর অতিমর্ত্য শক্তির কাছে সকল বাধা দূর হয়ে গিয়েছিল। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম সত্যাগ্রহী বাংলার নিমাই পণ্ডিত।

বলেছি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল।

তিনি যদি দেশের ঐরকম সংকটাপন্ন সময়ে ভারতবাসীর কাছে প্রেমের বাণী প্রচার না করতেন তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করতো আর সমস্ত দেশটা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেত। শুধু প্রেমের বাণী প্রচার করা নয়, তাঁর শিক্ষার পদ্ধতিটাই ছিল

আহ্লাদ। তাঁর শিক্ষা ছিল প্রেম, অকপটতা, সারল্য, ঈশ্বরসেবা, ভক্তসেবা ও ঐক্যের ওপর সংস্থাপিত। শুধু ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি এমন শিক্ষার আলো জ্বালালেন যার ফলে যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত অন্ধকার নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হলো।

দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে এক নতুন বাণী নিয়ে এলেন শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, ঠিক তাঁর আগে যেমনটি এনেছিলেন করুণাঘন বুদ্ধদেব। এঁরা দুজনেই ছিলেন পন্থা আবিষ্কারক। ভগবানের নাম ও ধ্বনি হলো মহাপ্রভু-প্রবর্তিত পন্থা। তিনি ঘোষণা করলেন—ভগবানের নামের ভেতর দিয়েই মানুষ তার দিব্য পারমার্থিক প্রকৃতির উন্নতি সাধন করতে পারবে আর আরোহণ করতে পারবে সকল রকম ধ্বংস-প্রবণতা ও তার পরিণতির ঊর্ধ্বে। যা এতকাল ছিল আমাদের দূর কল্পনার বিষয়, মহাপ্রভুর হাতে তা একটি বাস্তব-বিজ্ঞানে পরিণত হলো।

ভগবানের নাম আর স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

এই কথা ঘোষণা করলেন নবদ্বীপের ঠাকুরটি।

শুধু ঘোষণা করা নয়, প্রমাণিত করলেন। প্রমাণিত করলেন অপ্রাকৃত বিষয়ক শব্দ এবং অর্থের—উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের একত্ব। শব্দ এবং রূপ নিয়েই তো জগতের সৃষ্টি। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি ভগবানের নাম আর নামকীর্তনের গুরুত্ব। নামকীর্তন মানেই তো গুণকীর্তন। নাম-সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। তিনি বললেন, বিনীতভাবে ভক্তিসহকারে ও অকপটে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে, ভগবান নিজে তাঁর ভক্তদের কাছে সুপ্রকাশ হন। এমন আশ্চর্য কথা পৃথিবীতে কে কবে শুনেছে?

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নবদ্বীপচন্দ্র সেদিন ঘোষণা করেছিলেন: শুধু ভগবানের নামকীর্তন করেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই হলো তাঁর অভিনব দর্শন—সাধনমার্গে মৌলিক অবদান। সাধনার পথ প্রসারিত করলেন তিনি, স্থাপন করলেন পদ্ধতি ও

সাধনার ধারা। সমস্ত জিনিসটাকে দান করলেন একটি বিশিষ্ট রূপ ও সুসম্বদ্ধতা। নামকীর্তন উন্মত্ত চীৎকার নয়। মানবজীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি কাজে ভগবানের বিদ্যমানতা বা অস্তিত্বের অনুশীলনই প্রকৃত নামকীর্তন।

দেশের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য আজ আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী স্মরণ করবার সময় এসেছে। আজ যেসব শোচনীয় সমস্যা আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খল ও ব্যর্থ করে দিয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগেরই সমাধান পাই আমরা তাঁর জীবনে ও শিক্ষায়। এই বিস্ময়কর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের শিক্ষাকেই আজ আমাদের হৃদয় মন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

॥ দুই ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার মূল্য অনেক। গুরুত্বও কম নয়। তা চিরকাল মানবজাতিকে প্রেরণা দান করবে। আলো দেখাবে। তাঁর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক সূর্যের প্রকাশ যেমন মনোরম, এই জাত্যভিমান জর্জরিত অধঃপতিত বাংলায় মহামানব মহাপ্রভুর সারা জীবনব্যাপী প্রেমের অবতারণা তেমনি মুগ্ধকর।

একথা লক্ষ বার সত্য যে, প্রেম পৃথিবীতে একবারমাত্র রূপ গ্রহণ করেছিল—তা এই বাংলায় শ্রীচৈতন্যরূপে। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্মই যুগধর্ম। তিনি শুধু বাংলা বা বাঙালীর নন—তিনি সমস্ত পৃথিবীর জন্য, সকল মানুষের জন্য। তাঁর ধর্মযাজনা করার অর্থ সর্ব অনর্থনাশ। তাইতো তিনি আজ নিখিল মানবের প্রাণের দেবতা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও আরো অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ নব-প্রবন্ধ বৈষ্ণবের গানের প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ।

একথা সকল মহাজনই একবাক্যে বলেছেন: শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-

মৃতের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অন্যের ভজনা করতেন। পরে চৈতন্যচরণ-কোকনদে তাঁরা নিজেদের সমর্পণ করে ধন্য হয়েছেন, কৃতার্থ হয়েছেন, পরিতৃপ্ত হয়েছেন। মহাপ্রভুই তো জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবার জন্য নির্দেশ দিলেন—জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, তার স্বরূপের জাগরণ সম্পাদন করা। কিন্তু নিজে না প্রবুদ্ধ হলে আর একজনকে কি করে জাগান যাবে?

নিজেকে জাগতে হবে, এই হলো শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা।

কৃষ্ণকে না জানা অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্মুখতাই মানুষের সকল অনর্থের মূল।

কৃষ্ণোন্মুখতা ভিন্ন কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না। এই সত্যটি আগে বেশ ভাল করে বুঝতে হবে, তারপর অন্যকে বুঝাতে হবে। তাইতো মহাপ্রভুর আদেশ :

প্রতি ঘরে ঘরে যাই কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥[১]

সকলের কাছে গিয়ে তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিতে হবে পরমার্থের অনুসন্ধান। একথা, তাঁর আবির্ভাবের পাঁচশো বছর পরে আজ আর বলবার প্রয়োজন নেই যে, মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণ করলেই জগতের যথার্থ কল্যাণ। তাঁকে ভুলে গিয়েই তো মানুষ শান্তি হারিয়েছে, আনন্দ হারিয়েছে—তারা হাহাকার করছে সর্বক্ষণ। বাংলার বর্তমান অবস্থাটা চিন্তা করলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় না কি? অবশ্য এখন সব দেশেরই প্রায় সমান অবস্থা।

দেশের সকল চিন্তানায়ক এবং ঐতিহাসিক একবাক্যে বলে গিয়েছেন যে, প্রেমাবতারী ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম, সেবা ও মৈত্রীর ভুবনমঙ্গল বাণীই মানুষকে প্রদান করবে শাশ্বত শান্তি। জীবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য কেন আজ তাঁর অবদান বিশ্বজয়ী হয়ে উঠেছে? এর একটিমাত্র উত্তরই আছে। তাঁর পথ ও মত শ্রুতিসম্মত নিত্য

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শাশ্বত ও সত্য। মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধান চৈতন্যদেবের বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তির অমৃত প্রবাহে সঞ্জীবিত হয়ে বাঙালী, ভারতবাসী আজ নবীন প্রাণের জোয়ারে বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন।'

কত বড়ো একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল মহাপ্রভুর মহা আবির্ভাবের ফলে।

অজ্ঞানকল্পিত অভিমান বিজৃম্ভিত সমাজের সর্বনাশকর উচ্চ নীচ ভাব দূরে বিসর্জন দিয়ে বাঙালী নর-নারী সজ্জন-দুর্জন, পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-যুবা সবাই মানুষ হয়েছিল, তৃণ-তুল্য নত হয়েছিল। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ ও শূদ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়েছিল। উচ্চ নীচ ভাব ভুলে গিয়ে সকলকে ভালবাসতে শিখেছিল। এমন অকল্পিত সামাজিক বিপ্লব ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের পর আর কখনো দেখা যায়নি। তাই তো মহাজনগণ মহাপ্রভুকে একটি যুগের মানুষ একটি যুগের দেবতা বলেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এই বর্ণনা পাই : 'তিনি দীর্ঘদেহী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে নিজের হাতের চার হাত পরিমাণ, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, নবমেঘের চেয়েও গম্ভীর তাঁর কণ্ঠ-ধ্বনি, তিলফুল জিনি নাসা, সুধাংশুবদন, ভক্তবৎসল, কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা-পরায়ণ, সর্বভূতে সমজ্ঞান, শান্তদান্ত, সকলের উপকারী, ভগবৎপ্রেম ছাড়া আর সব কিছুতে বিমুখ, চন্দনের অঙ্গদবালা ও চন্দন বিভূষিত হয়ে কৃষ্ণ কীর্তনকালে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তিনি নৃত্য করেন।'

এই রসবিগ্রহ, নিখিল মানবের প্রাণের প্রিয়তম দেবতা, মনুষ্য শরীর ধারণ করে, শান্তি ও প্রেমের বার্তা নিয়ে ১৪০৭ শকে ২৩ ফাল্গুন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারী সূর্যদেব অস্তাচল যাবার পর চন্দ্রগ্রহণের সময় নবদ্বীপধামে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিকে ধন্য করে উদয় হলেন। বিশ্বপ্রেমিক তাপস অদ্বৈত আচার্যের সাধনায় ও আহ্বানে গোলোকের অধিপতি সার্বজনীন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ অবতারী স্বয়ং ভগবান্ আমাদেরই দেশে রাধার ভাবকান্তিসহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্তি ধারণ করে

আমাদেরই দুঃখ শোক অশান্তি দূর করবার জন্য আমাদেরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশ্বে বয়ে গেল প্রেমের বন্যা :

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুব সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥[১]

সিংহরাশি-সিংহলগ্নে নবদ্বীপে অকলঙ্ক গৌরাঙ্গ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই দেখে সেদিন সকলঙ্ক চন্দ্র লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের কবি সেই দিব্য আবির্ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে .

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন?
সকলঙ্ক চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। সে সময়ে বাংলায় ধর্মের যে গ্লানি ঘটেছিল,. অপরিমেয় লোভ, স্বার্থপরতা, সদাচারহীনতা, ব্যভিচার, ঘোর তামসিকতা, নাস্তিক্য বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি, বিধর্মীর আচরণে ধর্মোন্মত্ততার তাণ্ডব নৃত্য, অরাজকতার যে ভীষণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা বর্ণনাতীত। একদিকে ধনী-দরিদ্রের সংঘাত, কৌলীন্য-অকৌলীন্যের সংঘাত এবং সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রম ধর্ম নানাভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কেবল বিদ্যাকুলের অহঙ্কার, বিষয়ভোগের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে নাস্তিক নব্য ন্যায়ের প্রখর তাপে বাংলা জর্জরিত। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে নব-ন্যায় তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই পরিবেশেই এসেছিলেন কাঙালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ছেলেবেলায় তিনি নিমাই নামে অভিহিত ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যেদিন তিনি নবদ্বীপে সমাগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে পরাজিত করলেন সেদিন থেকেই সেই পরাজয় জগতে ঘোষণা করলো নিমাইয়ের বিদ্যাবত্তার মহিমা। নদীয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁরই জ্ঞানালোকে।

ষোল বছর বয়সে পিতৃকার্য করতে গয়াতে গিয়ে পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তার কাছেই তিনি লাভ করলেন পারমার্থিক দীক্ষা। এখন থেকে নিমাইয়ের প্রবল ধর্ম ভাব দেখে সবাই বিস্মিত হয়। এক আশ্চর্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাঁর মধ্যে। সেই ঘোর তার্কিক, নৈয়ায়িক, স্মৃতিবাদী এবং আলঙ্কারিক মানুষটি যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। তিনি এখন সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে দেখার জন্য ব্যাকুল; তাঁর অন্তর প্রেমভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি কখনো কাঁদেন, কখনো হাসেন, কখনো নৃত্য করেন আর কখনো বা গান করেন।

এ যেন এক নতুন মানুষ।

গয়া থেকে ফেরার পর আর অপরাবিদ্যার মোহ রইল না—এখন থেকে তার ছাত্রদের মনে তিনি পরাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। পরাবিদ্যা কি? প্রশ্ন করে একটি ছাত্র। নিমাই পণ্ডিত অম্লান উত্তর দেন—যে বিদ্যার সহায়তায় মানুষ ভগবানকে সাক্ষাৎ করার পরম সৌভাগ্যলাভ করে তারই নাম পরাবিদ্যা। নবদ্বীপের জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে পেলো এক অভিনব সহজ ও সরল বার্তা: তোমরা সবাই কঠোর নৈতিক জীবনযাপন কর আর প্রেমে কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।

—তাতে আমাদের লাভ?

—দূরীভূত হবে যাবতীয় পাপ। লাভ করবে পবিত্র ধর্মজীবন।

এইভাবেই জনসাধারণের জীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণের স্পন্দন, নতুন অনুভূতির উদ্দীপনা। ধূলিসাৎ হয়ে যায় সংকীর্তনের

মাধ্যমে মানুষের গড়া কৃত্রিম ব্যবধান আর জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী। সবাই পায় পরমার্থের দুর্লভ অধিকার। এইভাবে জাতির চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনে নিমাই পণ্ডিত যে বিপ্লব এনেছিলেন, তেমনটি এর আগে বাংলার ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি।

কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। স্বার্থপর পুরোহিতগণ আর স্বার্থপর পণ্ডিত ও ছাত্রগণ তাঁর আন্দোলনকে ভীষণভাবে বাধা দিতে থাকেন। গোঁড়া এবং সংকীর্ণমনা হিন্দুরা সংকীর্তন বন্ধ করবার জন্য রাজসরকারে অভিযোগ নিয়ে এলেন নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। চাঁদকাজী তখন নদীয়ার কালেকটর। তিনি এলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে। খোল ভাঙলেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হয় প্রকাশ্য এবং সমবেত কীর্তনের ওপর। বলা হলো—নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাস্তি হবে, এমনকি ধর্মান্তরিত করা হবে। মহাপ্রভু গ্রাহ্য করলেন না চাঁদকাজীর এই নিষেধাজ্ঞা।

তারপরেই একদিন নবদ্বীপের রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা সবাইকে আকৃষ্ট করে। এক বিরাট সংকীর্তন দল প্রকাশ্য-ভাবে রাস্তার উপর দিয়ে কৃষ্ণ-কীর্তন করতে করতে চলেছে। পরিচালক স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত। শোভাযাত্রার পরিসমাপ্তি হয় বিচার-সভায়। চাঁদকাজীর সঙ্গে বিচারে বসলেন তিনি। ঘটালেন কাজীর চিত্তের পরিবর্তন। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো। এইভাবে তিনি দেখালেন, হিংসা ও চিত্তের ধর্মবিরুদ্ধভাব, শুধু প্রেম ও বিচারের দ্বারা জয় করা যায়।

তাই বলেছি, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নবদ্বীপের এই প্রেমের ঠাকুরটি হলেন প্রথম সত্যাগ্রহী। জাতির এক মহা দুর্দিনে তিনি এসেছিলেন। এমন সময়ে এসেছিলেন যে, তখন যদি না আসতেন গৌরসুন্দর, তবে আমরা টিকতাম না। এ জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উবে যেত। একথা শুধু ভক্তের কথা নয়, ঐতিহাসিক সত্য। সে সময় মহাপ্রভু যদি না আসতেন আমাদের মাঝে, তাহলে আমরা বাঁচতাম না। তিনি এসে গেছেন পাঁচশত বছর প্রায়। এ পাঁচশত

বৎসর আমরা থাকতাম না, অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। তিনিই যে আমাদের রক্ষা করেছিলেন এতে কোন সংশয় নেই। ইতিহাসও এই কথা বলে। জাতির ভীষণ দুর্দিনে মহাপ্রভু এসে জাতিকে বাঁচিয়েছিলেন।'[১]

॥ তিন ॥

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন নিমাই পণ্ডিত।

জাতি ও বংশের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে তিনি ঐ বিশ্বাসেরই প্রাধান্য দিতেন।

এজন্য তাঁকে বিরোধীদের সহিংস প্রতিকূলাচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিরোধিতা করেছিলেন স্বার্থপর পুরোহিত ও ক্ষমতান্ধ অধ্যাপকমণ্ডলী—এঁরা সকলেই বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী ছিলেন। তখন এই বিরোধী দলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য নিমাই সংকল্প করলেন তিনি সন্ন্যাসী হবেন। বিরুদ্ধবাদীদের চিত্ত জয় করবার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

মহাপ্রভুর যেই কথা সেই কাজ। স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীর শত কাতর অনুরোধ ও অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে তিনি অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম প্রেমাস্পদ—তাঁর বিরহে উন্মত্তপ্রায় হয়ে তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করেছিলেন। এটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আরো মহৎ—তাঁর অনুবর্তীদের ঈশ্বর সেবায় সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেবার জন্য নিজেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন।

কোথায় এবং কবে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন?

তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে এক মাস বাকী ছিল। মাঘ

---

১ পাঁচটি ভাষণ : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

মাস, শুক্ল পক্ষ। সূর্যের উত্তরায়ণ যাত্রার প্রথম দিন। নবদ্বীপ থেকে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে কাটোয়া নগরে উপনীত হয়ে কেশব ভারতীর কাছে বিধি মত সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। নিমাই পণ্ডিতের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরী যাত্রা করলেন।

এখানে এসে সোজা গেলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে।

মন্দিরে জগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত চিন্ময় মূর্তি দেখে মূর্ছিত হলেন।

অতঃপর কিছুকাল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে অবস্থান। ইনি নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক পণ্ডিত। মুসলমান নিগ্রহের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য উড়িষ্যার পুরীর হিন্দু রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এঁর সঙ্গে বিচারে বসে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

অতঃপর শুরু হয় শ্রীচৈতন্যদেবের ভারত পরিক্রমা।

১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে নির্গত হন।

প্রচার করলেন সবত্র তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

বললেন, ভোগবাদ প্রকৃত মনুষ্য মর্যাদার অনুপোযোগী। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী মানব-মর্যাদার অযোগ্য। মানুষের জন্মাধিকার ছিল অনন্ত জীবন। অনন্ত অপরিসীম আনন্দ ভূমা পুরুষের সেবায়, দেহ-মনের সেবায় নয়। যে রূপেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, কর্মবাদ কখনই মানবসমাজে মঙ্গল প্রদানে সমর্থ হবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম, সমন্বয়বাদ, বিশ্বপ্রেম, অহিংসা নীতি, নিঃস্বার্থপরতা চিত্তবিনোদন শব্দ মাত্র।

তাঁর শিক্ষার অসাধারণ অভিনবত্বে আকৃষ্ট হলো অসংখ্য চিত্ত। এর অলৌকিক অভিনবত্ব লোক-সকলকে মুগ্ধ করলো। হাজার হাজার লোক দলে দলে শ্রীচৈতন্যদেবের চারদিকে সমবেত হয়। মুগ্ধ হয় সকলে তাঁর শ্রীঅঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে। তিনি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবতার, যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর আকর্ষণের একমাত্র প্রকৃত

কেন্দ্র। দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিব্রাজক জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

স্থান—রাজমহেন্দ্রীতে কোটিলিঙ্গম মন্দির। তার বিপরীত দিকে গোষ্পদের প্রসিদ্ধ স্নানঘাট। সেই ঘাটে অগ্রসর হবার সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব দেখলেন একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সহকারে উৎকলের গঙ্গাবংশীয় প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের গোদাবরী প্রদেশের রাজ্যপাল সমভিব্যাহারে আসছেন। এই সমকালো শোভাযাত্রা ' ত সলিলা গোদাবরিতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গোদাবরীর পবিত্রতা হিন্দু ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকেই সুপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন সন্ন্যাসীর ছদ্ম আবরণে লুক্কায়িত অপারিসীম অনুরাগ সেই আপাত দৃষ্টিতে বিজাতীয় ভাবসম্পন্ন সর্বাবিধ রাজকীয় ঐশ্বর্যসমন্বিত ব্যক্তির সহিত মিলিত হবার জন্য এক অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। যে সন্ন্যাসী বিষয়কোলাহলরত পার্থিব সম্পদ সম্পন্নজনের অনুগ্রহ ভাজন হবার সকল আশা পরিহার করেছেন, তাঁর পক্ষে সেই সব রাজকীয় ঐশ্বর্য ছিল মিলনের পথে প্রতিকূল অবস্থা।

এই দুই বিরুদ্ধ ভাবালম্বীয় সাক্ষাৎকারের মর্ম উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বাস্তবিকই দুরূহ ব্যাপার। সন্ন্যাসী কেন একজন রাজপুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এত ব্যাকুল? আবার সুদক্ষ শাসকশ্রেষ্ঠ কি কারণে তখনই সেই সংসার বাসনাত্যাগী অজ্ঞাত পুরুষের সংস্পর্শে আসতে উন্মত্ত হলেন? উড়িষ্যার সম্রাট তাঁর রাজ্য কৃষ্ণানদীর উত্তরতীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। রায় রামানন্দ পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী রাজ্যের শাসক। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর কান্তা বৃষভানু নন্দিনীর মিলিত তনু। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যিনি অদ্বৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রায় রামানন্দের নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করেছিলেন মহাপ্রভুকে। তাইতো তিনি স্বয়ং রায়

রামানন্দকে ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। একজন যখন রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অপরজনও প্রেমময় সনাতন শ্রীকৃষ্ণসত্তার সংস্রবে আসবার এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে চিনলেন।

চিনবেনই তো। কারণ তিনি যে তাঁর চিহ্নিত লীলা-পরিকর।

দণ্ডবৎ প্রণত হলেন রামানন্দ প্রেমাপ্লুত কলেবর সেই তরুণ সন্ন্যাসীবরের চরণে।

কিন্তু বিস্মিত হলেন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসীর এই আচরণ দেখে—রামানন্দের সংস্রবে তাঁকে অমন সপ্রীতিভরে আসতে দেখে। কারণ উচ্চপদস্থ হলেও রামানন্দ ছিলেন নিম্নকুলোদ্ভব। রাজসেবক এবং শূদ্র। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন—অভিভূত হয়ে পড়লেন ভাবাবেগে। সেদিন গোদাবরী তীরস্থ এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যাবেলায় রায় রামানন্দ একটি মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে সেইখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিভিন্ন আলোচনায় অতিবাহিত হয় কয়েক রাত্রি।

এই রায় রামানন্দ-সংবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তি ও সার।

প্রেমধর্মের অপ্রাকৃত গূঢ়রহস্য ব্যক্ত হয়েছে এই আলোচনার মধ্যে।

ধর্মজগতে এই মিলন আর এই আলোচনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই প্রাকৃত জগতে মাত্র ৪৮ বছর বিদ্যমান ছিলেন। তার মধ্যে ২৪ বছর নবদ্বীপে এবং অবশিষ্ট সন্ন্যাসী জীবনের ২৪ বছর ধর্মাচার্য বা ধর্মশিক্ষকরূপে নীলাচল ও ভারতের বিভিন্ন ধর্মস্থানে অতিবাহিত করেন। শেষ ২৪ বছরের মধ্যে ছয় বছর তীর্থ ভ্রমণ, ছয় বৎসর ভক্তি মহিমা প্রচার এবং বাকী বারো বছর

কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদনায় স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে কালাতিপাত করেন।

শ্রীচৈতন্যের বিশ্বব্যাপী শক্তির উৎস ছিল তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামিগণ। রূপসনাতন প্রভৃতিকে তিনি একটি নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এঁরা একটি নতুন সংস্কৃতির সংগঠক ছিলেন। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ স্থান দাবী করতে পারেন। অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি। সাধুসন্তগণের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রীতিভাজন। রূপ, সনাতন ও রামানন্দ রায়ের মতো উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত এবং রঘুনাথ দাসের মতো মর্যাদা ও ঐশ্বর্যে অবস্থিত শত শত মানুষকে, এমন কি জগাই মাধাই এর মতো পাষণ্ডদের জাগতিক ভোগবাসনা থেকে মুক্ত করে তিনি নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্যদেব হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত প্রেমসিঞ্চিত আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার বাণীর সাহায্যে পবিত্র করেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। সুবুদ্ধি রায় এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুবুদ্ধি রায় যখন চরম দুর্দশায় উপনীত হয়েছিলেন, সেই সংকট মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্তের উপায় নির্ধারণ করেছিলেন। এমন বিশ্বজনীন সহানুভূতি পৃথিবীতে বিরল। দীক্ষিত হোক, অদীক্ষিত হোক, যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তাকে কৃষ্ণ-প্রচারে তিনি উৎসাহিত করেছেন। এমনই উদার তার শিক্ষা যে তার অনুসরণ করতে দীক্ষা বা পুরশ্চর্যার প্রয়োজন হয় না। তিনি পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছেন, যে কোন ভাবেই হোক, হেলায়, এমন কি বিদ্রূপের ভাবেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধানে পৌছান যায়।

তাঁর আটচল্লিশ বছরের জীবন অক্লান্ত কার্যাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর সেই সব কাজ নিয়োজিত হয়েছিল ভারতের আধ্যাত্মিক ভূগোলের মিলন-সাধনের দিকে। তাঁর জীবনে দেখা যায় যে,

সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরেই প্রায় ছয় বছর ধরে পরিব্রাজকরূপে পদব্রজে তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণ নিরর্থক ছিল না, বা পার্থিব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি এই সময়ে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন উপদেশ আদর্শের মধ্য দিয়ে। এই তত্ত্বই অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥
তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন—সকলেই দুঃখ-নিবৃত্তির পথের সন্ধান করেছেন, কিন্তু আরাধ্য বস্তু কি, তা নির্ণয় করেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি ঘোষণা করেছেন: 'নিরস্তকুহক' সত্যং পরং ধীমহি।' ভারতবর্ষের মহতী কৃষ্টি এই আর এই কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন মহাপ্রভু।

সন্তাপ তিন প্রকার, যথা—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানসিক; আধিভৌতিক অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ দৈবাদি প্রাকৃত ঘটনা থেকে জাত। ধনী, নির্ধন, ভিখারী ও রাজা—সকল মানুষকে এই ত্রিতাপে দগ্ধ হতে হয়। এই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ভগবান শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ। ভারতের তাবৎ ধর্মশাস্ত্রই এই ত্রিতাপ দূর করবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন: কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ঘোষণা করলেন:

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥

বৈদিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল কেন? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের সংযোগ যাতে মানুষের জীবনে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা না আনতে পারে, সেইজন্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি। এর পরবর্তী স্তরে যাঁরা আহার,

নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের প্রতি বিরূপ. যাঁরা জানেন ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিণামে যে দুঃখ ডেকে আনে তাঁদের ঐ ধর্ম, অর্থ, কাম থেকে দুঃখ নিবৃত্তির সন্ধান দেবার জন্য—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—একমাত্র ভগবানই শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।

তাঁকে জানতে পারলেই সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হবে।

এত বড়ো কথা পৃথিবীর আর কোন ধর্মশাস্ত্র বলে নি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এই প্রপঞ্চে পাওয়া যায়, কিন্তু যা ইন্দ্রিয়াতীত তা পাওয়া যায় শাস্ত্রে। তবে আজকাল শাস্ত্রালোচনা হয় না, কারণ বর্তমান যুগের গুরুবাদ সেই শাস্ত্রের স্থান দখল করেছে। এটাই তো আমাদের দুর্ভাগ্য। গুরুদেব যা বলেন তাই-ই শাস্ত্র; কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং অর্জুনকে গীতায় বলেছেন:

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্॥

এই শাস্ত্র আজকাল আলোচনা নেই। স্কুল, কলেজ, মঠ, মন্দির কোথাও এর পঠন-পাঠন, অনুশীলন নেই। কারণ আমার গুরুবাক্যই শাস্ত্র। কিন্তু এ আদৌ ঠিক নয়। গুরুবাক্য যদি সাধুত শাস্ত্রবিরোধী হয়, তা স্বীকার্য নয়। 'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা।'—নরোত্তম ঠাকুরের এই বাণী স্মর্তব্য। কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন:

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই যে প্রমাণ॥

ভাগবতধর্মই মানুষের নিত্য ধর্ম। সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিনটি গুণের অতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকাতেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকটিত এই ভাগবতধর্ম বা সার্বভৌম ধর্মের প্রকাশ এবং অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই আস্তিক্য দর্শনকে প্রদান করেছে পরিপূর্ণতা আর সুসমন্বয়। ভেদবুদ্ধি-কলুষিত ধর্মজগতে এর প্রয়োজন ছিল। মহাপ্রভু আমাদের বললেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তিসাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন আর তাঁর প্রেমই সাধ্য। এই প্রেম-ভক্তির দর্শনই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-

বাদের স্বর্ণবেদী রচনা করেছে। এই প্রেম-ভক্তি ধর্মের কথা আর নাম-সংকীর্তনের মাহাত্ম্য এইবার সংক্ষেপে আলোচনা করব। নাম-সংকীর্তন দ্বারাই লাভ হয় দুর্লভ প্রেম-ভক্তি সম্পদ।

॥ চার ॥

শ্রীবেদব্যাস আত্মদর্শনের স্বরূপ বর্ণনা করেই রচনা করেন 'বেদান্তদর্শন।'

ব্যাস-প্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত অর্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে অনেকেই শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকেই বেদান্তদর্শন মনে করেন। দর্শন বললেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকবে। দৃষ্টা ও দৃশ্য না থাকলে দর্শন কি প্রকারে সম্ভব। পুরীতে অদ্বৈতবেদান্তী সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর কাছে বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য বর্ণনা করলে তিনি বলেছিলেন :

'. সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি,—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছা ॥[১]

মহাপ্রভু পুরীধামে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে এবং কাশীতে প্রকাশানন্দের কাছে বেদান্তদর্শনের যে দিগ্‌দর্শন করেছেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে তার সুন্দর বিবরণ আছে। এই দর্শনের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে হলে মধ্বাচার্যের 'অনুভাষ্য', রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', নিম্বার্কের ভাষ্য, জীব গোস্বামীর ভাষ্য এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্য'—এইগুলি পাঠ করতে হয়। শেষোক্ত ভাষ্যটিতেই

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রুতিপ্রমাণসহকারে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।

বেদান্তদর্শনে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় বর্ণিত আছে। সেব্য ভগবান নিত্য, সেবক জীবনিশ্চয় নিত্য এবং জীবের ভগবৎ সেবা নিত্য। আমাদের দেশে পণ্ডিতগণ প্রায়ই একটি ভুল করে থাকেন। তাঁরা বেদের সর্বাংশ বিচার না করে স্বমত-স্থাপনের জন্য অংশবিশেষ মাত্র গ্রহণ করে থাকেন। এর দ্বারা কিন্তু বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদের একদেশিক বিচার অবলম্বন করেই তো নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং কোন স্থানে ত্রিগুণময় বলে বর্ণন করেছেন। তাঁদের ধারণা বিগ্রহযুক্ত হলেই ব্রহ্ম বা ভগবান্ ত্রিগুণাধীন হন। কিন্তু মহাপ্রভু বললেন ভগবদ্বস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নন, পরন্তু তিনি অনন্ত চিদ্গুণরাশির আধার সবিশেষ বিগ্রহ। আরো বললেন, শ্রীভগবানের নাম নিত্য, রূপ নিত্য, গুণ নিত্য, পরিকরগণ নিত্য, লীলা নিত্য, লীলার আনন্দ নিত্য।

এই লীলানন্দই আত্মদর্শনের প্রেমতত্ত্ব।

শ্রুতি বলেন,—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' অর্থাৎ, আত্মবস্তু দর্শন করতে হবে, চিন্তা করতে হবে এবং ধ্যান করতে হবে।

এই আত্মবস্তু আর কিছুই নয় হরিসম্বন্ধি বস্তু দর্শন।

গোপালতাপনী বলেন,—'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন মনসঃ কল্পনম্।' অর্থাৎ, শ্রীগোবিন্দে ভক্তিই ভজন। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা-বাসনা বিসর্জন করে এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মেতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতে হবে শুদ্ধ মনের প্রেম নিয়ে।

উপনিষদেরও সেই একই কথা—ভগবানকে প্রিয় বুদ্ধিতে ভজনা করবে। অসীম ভগবানের ভালবাসা, অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঙ্গে সসীম জীবের সহায়শূন্যতার অনুভূতি, পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভগবদিচ্ছার বশ্যতার সঙ্গে অসীমের সঙ্গে সসীমের যে সম্বন্ধ তাই-ই ভক্তি নামে

অভিহিত হয়েছে। ভক্তির আগের অবস্থাই শরণাগতি। ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

শাণ্ডিল্যসূত্রে 'ঈশ্বরে পরানুরক্তিই' ভক্তি নামে অভিহিত হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন : ভোগ বা মোক্ষের ইচ্ছা এবং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছা—এই দুই প্রকার ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কেবল কৃষ্ণে প্রীতির জন্যই কৃষ্ণে আত্মনিয়োগের নামই ভক্তি। সকল বৈষ্ণব মহাজন একবাক্যে বলেছেন, একমাত্র ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য। আর মহাপ্রভু স্বয়ং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন : ভক্তিই জীবের স্বধর্ম।

এই ভক্তি ঊর্ধ্বতম ভূমিকায় আরোহণ করে 'প্রেম' নাম ধারণ করে। চৈতন্যচরিতামৃতের কবি লিখেছেন :

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥[১]

প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম—শুধু এই ত্রিবর্গ নয়, চতুর্থবর্গ মোক্ষও স্থান পায় না। যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমের সেবক তাঁরা জাগতিক আনন্দের অভিলাষী না হয়েও আনন্দলীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অতুল আনন্দের অধিকারী হয়ে থাকেন। সেই আনন্দসমুদ্রের তুলনায় ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি প্রেম কত উচ্চস্তরের জিনিস।

এই অনর্পিতচর প্রেমভক্তি-স্বরূপ উন্নত উজ্জ্বল রস পৃথিবীর মানুষকে দেবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারলীলা পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রেমভক্তিতে মানুষের চিত্ত যত সমৃদ্ধ হবে, অভিসিঞ্চিত হবে ততই জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের পরিবর্তে প্রেমের আলিঙ্গন হবে।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তখনই এই পৃথিবী যথার্থ পূর্ণ সুখের আগার হয়ে উঠবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার বলেছেন: 'জগতে যত ধর্মপ্রচারক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মানুষের শুদ্ধচিত্তের এই প্রেমানন্দের সন্ধান একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুই দিয়ে গেছেন।'

শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার ঐকান্তিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের আজ মনেপ্রাণে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে—উপলব্ধি করতে হবে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত কৃষ্ণনাম' 'সংকীর্তনের মহিমা। কি সেই মহিমা? তাঁর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই সংকীর্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন করে স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন:

চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন মলিনচিত্ত-জীবের হৃদয়দর্পণ মার্জন করেন, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণ কিরণ বিতরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন অপ্রাকৃত-বিদ্যাবধূর জীবন, জীবের অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দসমুদ্র বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব আত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদনকারী।

এই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনা।

যারা ভাগবতধর্ম আশ্রয় করবেন এবং ভাগবত ধর্মের অনুশীলন করবেন তাঁদের একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ন থাকতে হবে। ভাবের সার বা ঘনীভূত অবস্থাই প্রেম। প্রেমই মানুষের পরম পুরুষার্থ। ভক্ত হৃদয়ে এই প্রেম অনুভূত হয় একমাত্র কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের দ্বারা। শুধু অনুভূত হওয়া নয়, উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই নামসংকীর্তনকেই ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে গৌরাঙ্গলীলার প্রয়োজন হয়েছিল।

সংকীর্তন বলতে আমরা কি বুঝব?

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির উচ্চ ভাষণের নাম কীর্তন, সকলে মিলে যে কীর্তন, তাই সংকীর্তন। শ্রবণ এবং স্মরণ এই দুটিও এর মধ্যে অনুস্যূত। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ একই সূত্রে গ্রথিত—এরই অখণ্ড রূপ হলো সংকীর্তন। প্রেমেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নিহিত আছে আর সেই প্রেম লভ্য হবে একমাত্র কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন দ্বারা—'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। একমাত্র নাম-সংকীর্তনের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। নাম ও নামী দুইই অভেদ। শ্রীভগবান এবং তাঁর নাম অভিন্ন—ইহাই মহাজন বাক্য। নামের ফলেই প্রেমভক্তি লাভ হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রেম-ভক্তির স্বর্ণবেদীর উপর। পৃথিবীর সকল মানুষেরই এই প্রেম-ভক্তিতে অধিকার আছে—স্বয়ং মহাপ্রভুর এই ঘোষণা। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর সেই উক্তিটি স্মর্তব্য :

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥

॥ পাঁচ ॥

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উপাসনার কথা আছে। অতএব বৈষ্ণবধর্ম যে সুপ্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি সূক্তের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে :

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষাপিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদবিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥

এর ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য বলেছেন : 'হে স্তোতৃগণ ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, সেইরূপ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনি সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করেছেন তাঁরই অনুগ্রহ হলে তাঁর স্তুতি করতে পারা যায়। তাঁরই নাম সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময়। সেই নামকে সকল রকম পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় জেনে তাঁরই নাম উচ্চারণ করতে থাক। হে বিষ্ণো ! এই ভাবে তোমার নাম করতে করতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপসাক্ষাৎরূপ সুমতি লাভ করতে সমর্থ হব।'

এই ব্যাখ্যানুসারে বিষ্ণুই আদি দেবতা।

তাঁর নামই উপাস্য। কারণ তাঁর নামই জ্যোতির্ময়।

সেই তাঁর চিন্ময় নাম সাধনার দ্বারা তাঁর করুণা বর্ষিত হয় নাম সাধকের উপর এবং সাধক তাঁর স্বরূপ সাক্ষাৎ লাভ করবার মত শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখছেন : 'হে বিষ্ণো ! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আর সেই হেতু তা স্বয়ং প্রকাশ। সেই নামের ঈষৎ মহিমা জেনে অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জেনেও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সমর্থ হব।'

বিষ্ণুর উপাসনায় নামকে আশ্রয় করার উপরে দুজনেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ নামের এমন মহিমা বা শক্তি যে একমাত্র নাম সাধনার দ্বারাই বিষ্ণুর দর্শন লাভ করতে পারা যায় বা তাঁকে জানা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেন কলিতে নামের মাহাত্ম্য প্রচারের দ্বারা জনচিত্তকে শুদ্ধ ও ভগবৎ সাক্ষাৎকারের উপযোগী করে তুলবার জন্যই বিশেষ করে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল পাঁচশো বছর আগে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ভক্তিধর্মে নাম সংকীর্তন ও নাম জপ অধ্যাত্মসাধনার প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত।

ঋগ্বেদে বৈষ্ণবধর্মের যে অঙ্কুরোদ্গম হয়, পরবর্তীকালে উপনিষদ, মহাভারত, আগমশাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্ম সংহিতার মধ্য দিয়ে তাই

উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে নানামুখী গতির পরিচয় ব্যক্ত করে। শ্রুতি থেকে উদ্ভূত হয়ে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে এর একটি বেগময় ও ক্রমবিস্তারশীল অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অবিরাম গতিতে বৈষ্ণবধর্মের সারভূত বিশ্বজনীন ভগবৎ-প্রীতিরূপ রসামৃত সিন্ধুর দিকে পরিণতি লাভের জন্য ধাবিত হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণ বিষ্ণুর স্থান গ্রহণ করেছেন।

এই ধর্মে কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

তাঁর চেয়ে আর পরতত্ত্ব নেই। যদিও মহাভারত প্রভৃতি একাধিক পৌরাণিক গ্রন্থে কৃষ্ণকে বিষ্ণু বা নারায়ণের অংশে অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তবু চৈতন্য-অনুবর্তী বৈষ্ণবসমাজ, যাঁরা কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কৃষ্ণের অংশাবতারত্বে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, কৃষ্ণই একমাত্র পরম পুরুষ, অন্য সব অবতার তাঁর কলা অংশ। কৃষ্ণই অবতারী, অন্য সব অবতার তাঁর থেকে উদ্ভূত—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করয়ে গণন।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ যে কারণ॥[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা তদেকাত্মরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আত্মারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করে আছেন। তাঁদের মতে আত্মা পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ কলার প্রকাশরূপ। পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জ্যোতির্ময় রূপ। ইনি মায়াবী। শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি থেকে বিভিন্ন অংশে অনন্ত প্রকার জীবের উল্লেখ আছে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। পরমাত্মা প্রত্যেক জীব শরীরে অণু

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আত্মারূপে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গ শক্তি মায়া দ্বারা আবৃত হয়ে অভিভূত অবস্থায় থাকে। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব।

একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানবেদ্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ।

'সনাতন শিক্ষায়' কবিরাজ গোস্বামী তা এইভাবে উল্লেখ করেছেন :

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তি রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশবিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥[১]

অর্থাৎ, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তিসমন্বিত তত্ত্ব। সেই অদ্বয়তত্ত্বই স্বরূপ শক্তির দ্বারা অনন্ত বৈকুণ্ঠ বিস্তার করে তাতে স্বীয় স্বরূপাংশে ষড়ৈশ্বর্যশালী নারায়ণরূপে এবং পরমাত্মা ও অবতারাদি স্বাংশস্বরূপে বিলাস করেন। তাঁরই জীবশক্তি থেকে বিভিন্ন অংশে অনন্ত জীব ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকট করিয়ে সৃষ্টি প্রভৃতির লীলা করে থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণে নারায়ণকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ দেবতা।

তিনি বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ।

তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য অক্ষর পুরুষ। জীবের পরম লক্ষ্য। তাঁকে পেলেই জীবের পরম মুক্তি সাধিত হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। তাঁরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তাঁর চেয়ে আর পরতত্ত্ব নেই তাঁর মধ্যেই ভগবত্তার পূর্ণ প্রকাশ। সর্বরূপী তিনি। তাঁর শক্তি ভিন্ন কারো প্রকাশ নেই। সকল অবতারের বীজ তিনি।

বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছট

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

রূপ—একটি মুখ্য প্রকাশ এবং অপরটি বিলাস। মুখ্য প্রকাশের বিশ্লেষণ চরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস এইভাবে দিয়েছেন :

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি, একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

অর্থাৎ, একই স্বয়ং রূপ যখন একই সময়ে অনেক স্থানে মিলিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্তিগুলি যদি গুণ-লীলাদির দ্বারা সকল ভাবেই মূল রূপেরই সমান হয়, তবে ঐ সকল মূর্তি মূল রূপের প্রকাশ-মূর্তি বলে পরিগণিত হয়।

কৃষ্ণের বিলাস অর্থে—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস নাম॥

অর্থাৎ, যিনি প্রায় মূল রূপের তুল্য শক্তিশ্বর, কিন্তু আকারে, বর্ণে ও নামে পৃথক, তাকে বিলাস মূর্তি বলে। বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি বলেন।

শুধু তাই নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য নতুন ধাম পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন। নারায়ণের নিবাস বৈকুণ্ঠে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি। কৃষ্ণের স্থান বৈকুণ্ঠের উপরে—কৃষ্ণলোকে। দ্বারকা, মথুরা, ব্রজধাম, গোকুল এবং বৃন্দাবন—এই চারধামে বিভক্ত কৃষ্ণলোক। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, অনন্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত গোলোকেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর স্বরূপ-ভূতা শক্তি যোগমায়ার নিত্য যোগ। যোগমায়াই এইখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে আবৃত করে মাধুর্য-রস উৎসারিত করে দেন। এই নিত্য বৃন্দাবনের লীলাক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্তি। এখানে তিনি দ্বিভুজ এবং মুরলীবাদক :

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর, নব নট কিশোরবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥

ব্রহ্মসংহিতা শ্রীকৃষ্ণের সার্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে বলেছেন :

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্ ॥

ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সর্বত্র যেরূপ যখন বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়, তখন বাংলায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব বেদান্ত সম্প্রদায়গুলির আচার্যগণ ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধের কথাই আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভগবানের ধাম, ভগবানের পরিকর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ভগবানের ধাম, ভগবানের পরিকর সব কিছুই যে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাস; জীব যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং ভগবানের সেবা-রূপ প্রেমানন্দেই যে তার স্বরূপ উপলব্ধি; জীবের সঙ্গে ভগবানের মধুর সম্পর্কে ভেদ ও অভেদ দুই-ই যে স্বীকার্য, সূর্য ও সূর্য কিরণের মতো শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে রয়েছে যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ—মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেই এই দার্শনিক তত্ত্বটা বিশেষ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তিধর্মের আকর গ্রন্থ ভাগবত। বৈষ্ণব আচার্যগণ এই গ্রন্থকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্বরূপ। বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের মূলে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করেছে এই ভাগবত। হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণে আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনেতিহাস। কিন্তু ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর মাত্র অবলম্বন করে তাঁর লীলাকে চিত্রিত করেছে। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলাকে কেন্দ্র করে ভক্ত এবং ভগবান এই দুইয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে এমন এক আবেগপ্লুত ভক্তিরস মিশ্রিত ধর্মের বৃত্ত রচিত হয়েছে, যা অনুপম।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ ভালবাসায় আত্মসত্তাবিলোপকারী গোপীদের প্রেমচঞ্চল হৃদয়াবেগের যেরকম নিখুঁত বর্ণনা এই মহাগ্রন্থে আমরা পাই তা বারম্বার পাঠ করেও মন তৃপ্ত হয় না।

প্রস্ফুটিত শতদলের মতো প্রেমের বৃন্তে বিকশিত হয়ে উঠেছে প্রেম-ভক্তির স্বরূপ এই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন আর প্রেমে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য হৃদয়ের যে আর্তি ফুটে উঠেছে তাই-ই জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল প্রতীকরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হয়েছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিত্যকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপরমণীদের প্রেমাকর্ষণের লীলা ভাগবতে বর্ণিত হলেও সেখানে শ্রীরাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

তবে রাধা এলেন কোথা থেকে?

অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডিত শ্রীরাধার অপার্থিব রূপরসের সবটাই ভক্তি-ভাবাপ্লুত বৈষ্ণবাচার্যদের নিজস্ব সৃষ্টি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরাই অধ্যাত্ম জগতে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিরূপে শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া' নিমাই যেমন কায়া ধারণ করেছিলেন, শ্রীরাধাও তেমনি ভক্তিরস-সিঞ্চিত বাঙালীর হৃদয়ের ভাবকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় শ্রীরাধার চিত্র ঐসব কবিদের ভাবাকল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে সত্য এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা ফুটে উঠেছে, এও সত্য; কিন্তু এই রাধাপ্রেম কি বস্তু, রাধাভাবের সাধনা কিরূপ, তা চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর শেষ জীবনের ধর্মাচরণের ভেতর দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। অতএব প্রেমভক্তি মার্গে রাধাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা চৈতন্যদেবই করে গিয়েছেন।

প্রেম মার্গে ভজন, রাগানুগা ভক্তির প্রচার এবং প্রেমকে পুরুষার্থ বলে স্বীকৃতি, ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের এক অভিনব অবদান। রাগানুগা ধর্মসাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: যথা—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্যরাগ। যদিও এই পাঁচটির মধ্যে মাধুর্যভাবের সাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং শ্রীরাধার প্রেমকে সাধ্যশিরোমণি বলে

গণ্য করেছেন, তথাপি তাঁরা অন্য চারটি ভাবের সাধনাকেও সানুরাগ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কান্তাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ শ্রীরাধার প্রেমকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অলৌকিক বস্তু বলে মনে করেন। একে তাঁরা স্থাপন করেছেন কল্পলোকের আদর্শরূপে। রাগানুগা সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীরাধার অলৌকিক প্রেমকে তাঁরা অভিনিবিষ্ট মনের কল্পলোক-চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস সংযোগে অনুশীলন করেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে আবির্ভূত হয়েছিলেন গৌরসুন্দর। তাই বৈষ্ণবধর্মে রাধাতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকারী একমাত্র তিনিই ছিলেন। এইবার আমরা সেই মহাআবির্ভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

॥ ছয় ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।
হরি পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ ॥

বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে রূপ গোস্বামীর এই শ্লোকটি প্রসিদ্ধ। শ্লোকটির অর্থ: সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনো দান করেন নি, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য অবতারের হেতু বিচারে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত লিখেছেন: 'কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারি রসের যে প্রাকাট্য, তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তি বিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ

হন। নাম সংকীর্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্বোক্ত চারি রসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, অতএব গূঢ়।'

রূপ গোস্বামীর এই শ্লোকটির সূত্র ধরেই আমরা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের তাৎপর্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থ আছে। সকল বৈষ্ণব মহাজন একবাক্যে নদীয়া অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার এই পৃথিবীতে বহুবার উদয় হয়েছেন। এই অবতারে এমন কি বিশেষ তত্ত্ব আছে যেজন্য মহাজনগণ নদীয়ার অবতারই সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলে ঘোষণা করলেন?

শাস্ত্রে আছে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্যশালী। তাঁর ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে বৈরাগ্য সর্বপ্রধান। প্রধান এবং শেষ। তাঁর কোন অবতারেই বৈরাগ্যের পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে ভগবান্ তাঁর এই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যটি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করে, এবং কলিহত জীবের উদ্ধার সাধন করে, তিনি স্বয়ং তাঁর অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে গিয়েছেন। বৈরাগ্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য কেন?

ভগবান্ সর্বশক্তিমান, সর্বসিদ্ধিদাতা সর্বনিয়ন্তা নির্গুণ পরমেশ্বর। তাঁর ঐশ্বর্য জাগতিক সকল বস্তুতেই পরিদৃশ্যমান। সর্বজীব তাঁর ঐশ্বর্যের পূজা করে থাকে। ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই, যিনি ভগবানের ঐশ্বর্য দেখে বিমুগ্ধ না হন, এবং তাঁর ঐশ্বর্যভাবে বিভাবিত হয়ে তাঁর চরণে আকৃষ্ট না হন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের অপূর্ব তেজোময় ঐশ্বর্যপূর্ণ চতুর্ভুজ মূর্তি প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর আর একটি মূর্তি আছে—সেটি তাঁর মধুরভাবের মূর্তি। তাঁর ঐশ্বর্যভাবের মূর্তি আরাধনার বস্তু, দূর থেকে প্রণাম করার বস্তু। আর ভগবানের মাধুর্যমণ্ডিত নরলীলার উপযুক্ত, নিখিল চিত্তাকর্ষক নরবপু অবতার মূর্তি ভালবাসার বস্তু, প্রেমের বস্তু।

জীবের মঙ্গলের জন্য ইচ্ছা করে জীবদেহ ধারণ করে নররূপে আবির্ভূত হন শ্রীভগবান্। পৃথিবীর মানুষের আপনজন হয়ে জীবের উদ্ধার কার্য সাধন করেন তিনি। এই তাঁর মাধুর্যভাব। এই মূর্তিই তাঁর মাধুর্যময় পরম প্রীতিমূর্তি। এর উপরে আবার যদি তাঁর বৈরাগ্য-উদ্দীপক কারুণ্যরসপূর্ণ জীবদুঃখকাতর প্রমূর্তির সমাবেশ হয়, তা হল জীবের পরিত্রাণের জন্য অন্য কোন উপায়ই চিন্তা করতে হয় না। কলিহত জীব বেদোক্ত এবং শাস্ত্রসম্মত ভজন-সাধন না করেও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে বিনা সাধনায় ও বিনা ভজনে ভগবানের কৃপাপাত্র হয়েছিলেন। নরোত্তম দাসের প্রার্থনায় তাই ঝঙ্কৃত হয়েছে—

নরোত্তম দাস কয়, গোরা সম কেহ নয়,
না ভজিতে দেন প্রেমধন।

বৈরাগ্যের সাহায্যে কলিহত জীবকে বিনা ভজন সাধনে উদ্ধার করবার জন্য নদীয়ায় শচীগর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে তিনি নিরুপায় হয়ে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য বৈরাগ্যবিত্তার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এরই সাহায্যে তিনি সকল জীবের চিত্তহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীভগবান তাঁর সর্বপ্রধান পরমপ্রিয় এই ঐশ্বর্যটি অতি সংগোপনে হৃদয়ে পোষিত করে রেখেছিলেন কলির কঠিন হৃদয় জীবের উদ্ধারের জন্য। যোগ যাগ তপস্যা করে যোগী ঋষিগণ যা পান নি, এইসব ভাগ্যবান কলির জীব ভগবানের বৈরাগ্যদীপ্ত মূর্তি দর্শনে তা লাভ করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

গৌরাঙ্গ অবতারে সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য শ্রীভগবানকে কোন অস্ত্রেরই সাহায্য নিতে হয় নি। মধুর হরিনাম মহামন্ত্র দান করে কলিক্লিষ্ট জীবকে তিনি কি ভাবে উদ্ধার করে গিয়েছেন, সে কাহিনী ভারতে সুবিদিত। তাঁরই শ্রীমুখে আমরা শুনি .

নামগুণ সংকীর্তন বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব সার নিজ প্রেমভক্তি

এই মত কলি পাপ করিব সংহার।
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার॥
এবে নাম সংকীর্তন খড়্গ তীক্ষ্ণ লঞা।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া॥
যদি পাপি ছাড়ি ধর্ম দূরদেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবেক তথায়॥
নিজ প্রেমে ভাসাইব ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব॥[১]

শ্রীগৌর-ভগবানের এই অদ্ভুত জীবোদ্ধার কাজের মধ্যেই তাঁর অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হয়েছে। পতিত অধমকে তিনি হরিনাম মহামন্ত্র দানে উদ্ধার করে, আপনজন করে নিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ অবতারে ভগবান অন্যান্য অবতার অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব দেখিয়ে, জীবের মন তাঁর চরণে আকৃষ্ট করে গিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের মতো, নিখিল মানবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে স্বয়ং গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীবেশে করঙ্গ-কৌপীন ধারণ করেছিলেন মহাপ্রভু। কেঁদে আকুল হয়েছিলেন জীবের দুর্গতি দেখে। তারপর তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য গোলোক থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব গুপ্তধন। সেই সম্পদ তিনি অকাতরে পাত্রাপাত্র বিচার না করে সকলকে দান করেছিলেন।

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে প্রতিপাদন করেছেন গৌরাঙ্গ-অবতার যেমন সর্বোত্তম, তাঁর লীলাও সেই রকম। মহাজনগণ সবাই একবাক্যে বলেছেন শ্রীভগবানের নরলীলা সর্বোত্তম। এই নরলীলার আকর্ষণী শক্তি অতি প্রবল। চৈতন্যজীবনে আমরা দেখতে পাই স্থাবর জঙ্গম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মহাপ্রভুকে দর্শন করে পুলকিত হয়েছিল। তিনি যখন বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরা পর্যন্ত হিংসা বিস্মৃত হয়েছিল।

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

গৌরাঙ্গলীলা অনুশীলন করলে বুঝতে পারা যায়, নদীয়ার অবতার মহাপ্রভু নরবপু ধারণ করে যেসব মধুরলীলা প্রকট করে গিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর নবদ্বীপলীলা অনুপম, বড়ই চিত্তাকর্ষক। কারণ এ ছিল প্রকৃত নরলীলা। আমরা যা করি গৌর-ভগবান তা করে গিয়েছেন, এ কথা ভাবলেই মন আনন্দে ভরে ওঠে, সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হয়। আমরা দেখলাম স্বয়ং ভগবান মানুষরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে, মানুষের মতো সংসার করে গিয়েছেন। এ মানুষের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয় ; মানবজাতির কম গৌরবের কথা নয়।

ভগবানের নরলীলা গৌরাঙ্গপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় পূর্ণবিকাশ হয়েছিল। আগের লীলায় যা কিছু অভাব ছিল, গৌরলীলায় তা পূর্ণ হয়েছিল। এইজন্য গৌরাঙ্গ প্রভুর নবদ্বীপলীলা ভগবানের সর্বোত্তম নরলীলা। গৌরাঙ্গচরিত অতি অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয়। বুঝি বা না বুঝি, কেবল মাত্র লীলা কথা শুনলেই জীবের অশেষ মঙ্গল হবে আর ভগবানে প্রীতি জন্মাবে। গৌরাঙ্গলীলা অনুশীলনের এই ফল। তাই বুঝি কবিরাজ গোস্বামী প্রত্যয়ের সুরে ঘোষণা করলেন :

যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি
শুনিলে বড়ই হয় হিত ॥[১]

মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির প্রাবল্য স্থাপন করাই হলো গৌর-অবতারের প্রধান তাৎপর্য। ভক্তির সঙ্গে প্রেম—বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেম কল্পতরু। মহাপ্রভুকে সর্ব অবতারের অবতারী বলে স্বীকার করা হয়েছে।

তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন

কলি লোক নিস্তারিব নিজ ভক্তি প্রচারিব
অবতার করিমু মো তথা।

১ শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত।

দান ব্রত তপধর্ম আর যত যত কর্ম
সব আরোপিয়া নিজ নামে।
কলি মহাদোষ দেখ এক মহা গুণ লেখ
মুক্ত মোর নাম সংকীর্তনে ॥[১]

এর মধ্যে একটি বিশেষ কথা আছে। গৌর-ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। সেটি ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবানের দীনভাব প্রদর্শন। ভগবানের এই ভাবটি মধুর থেকেও মধুর। জীবের চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য এমন জিনিস আর দ্বিতীয় নেই। কলিহত জীবের দুর্গতি দূর করে তাদেরকে কেশে ধরে উদ্ধার করাই গৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কথা তিনি নিজ মুখে অনেকবার বলে গিয়েছেন। এই কাজটি সম্পন্ন করবার জন্যই তো দীনতার প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয়েছিল—এটাও মহাপ্রভুর কথা :

ভুঞ্জিব প্রেমের সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকট করিব কলি যুগে ॥[২]

অন্য কোন অবতারে ভগবানের এই মধুর দীনভাব প্রকাশ পায় নি। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্‌গুরু। জগদ্‌গুরু হয়ে পৃথিবীর মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি অতি দীন হীন কাঙালের বেশে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছিলেন। পৃথিবী মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন তাঁর ওই মধুর দীন ভাবে। তাই তো তাঁকে দৈন্যের অবতার বলা হয়েছে।

নদীয়ার অবতার একদিকে যেমন প্রেমভক্তির অবতার, অপরদিকে তেমনি তিনি দয়ার অবতার এবং দৈন্যের অবতার। এইজন্যই মহাজনগণ চৈতন্য-অবতারকে সকল অবতারের সার বলে গিয়েছেন। গৌর-লীলার চমৎকারিত্ব ভাষায় অবর্ণনীয়। ষড়ৈশ্বর্যময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নবদ্বীপচন্দ্র পথের ভিখারী সেজে মানুষের কঠিন চিত্ত দ্রব করেছেন, পাষাণকে গলিয়েছেন। ভক্তরূপে তিনি জীবের সঙ্গ করতেন। ভগবানরূপে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতেন আর জগদ্‌গুরুরূপে তাদের ধর্মোপদেশ দিতেন।

১,২ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

এর পর কি আর তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ না করে থাকা যায় ?

তাঁর ঐশীশক্তি উপলব্ধি করবার জন্য সবাই ব্যাকুল হতো।

সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দকে তো তিনি এই দীনভাবেই আত্মসাৎ করেছিলেন। দীনভাব সর্বোত্তম ভাব। মাধুর্যের পরিপোষক এই ভাব। এইভাবে ঐশ্বর্যময় ভগবানে আদৌ সম্ভব নয়। মাধুর্যময় ভগবানের এই ভাবটি সর্বোত্তম। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুর্যের অবতার। তাঁর এই দীনভাবটি তাঁর অবতারতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য বোধক। এই সর্বোত্তম ভাবটি নিয়েই তো তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভক্তরূপ ধারণ করে তিনি নদীয়ায় আবির্ভূত হলেন কেন ? এই প্রশ্নটির তাৎপর্য তলিয়ে বুঝবার মতো। শ্রীভগবান রাধার ভাব ও কান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গসুন্দর রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে স্বয়ং আচরণ করে কলির জীবকে শিক্ষা দিলেন প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি লাভই কলিহত জীবের সাধ্য সাধন বস্তু। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ, যে ভালবাসার বন্ধন, যে মধুর প্রেম আবাহন তারই অন্য নাম প্রেমভক্তি।

ভক্ত ভগবানকে কিরূপ প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তাঁর অপূর্ব রূপমাধুরীরাশি কেমন প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন, তাঁর অনন্ত গুণরাজি শুনতে শুনতে তিনি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন, তাঁর ক্ষণিক সঙ্গলাভের জন্য প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের হৃদয় কি রকম লালায়িত হয়, তাই-ই দেখবার জন্য শ্রীভগবান এই প্রথম ভক্তের রূপ ধারণ করে নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভক্তের মহিমা প্রকাশ করতে তিনি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠ। সেই ভক্তমহিমার মর্ম বুঝতে, ভক্তের ভজনাদি ক্রিয়াকর্ম উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে, তিনি এসেছিলেন নদীয়ায় ভক্তরূপে। ভক্তভাব অঙ্গীকার করেই মহাপ্রভুর নদীয়ায় অবতার গ্রহণ। এই ভক্তভাব অঙ্গীকার করার আর একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজেই শ্রীমুখে বলেছেন

আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সভায়॥

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে কয়॥[১]

অংশাবতারের কাজ যুগধর্ম প্রবর্তন।

প্রেমদান কাজটা কিন্তু স্বয়ং ভগবানের এক্তিয়ারের মধ্যে।

অন্যের দ্বারা তা সম্পন্ন হবার নয়।

গোলকের সম্পত্তি অমূল্য প্রেমধন। তাঁর নিত্যপার্ষদ ভক্তদের সাহায্যে সেই দুর্লভ সম্পদ অকাতরে পৃথিবীর মানুষকে দান করবার জন্যই তাঁর নদীয়ায় আবির্ভাব। এও তাঁরই কথা :

যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি নানা রঙ্গে॥[২]

নিত্যসিদ্ধ ঋষি মহাজন তাই বললেন :

এই ভাবে কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপান নদীয়ায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের নূতনত্ব এইখানেই। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব, এই মহত্ত্ব সর্ববাদি সম্মত। আর সব অবতারে ভগবান মুখে ভক্তি মহিমা কীর্তন করেছেন, একমাত্র গৌর-অবতারে তিনি তা নিজে আচরণ করে কাজে তা দেখিয়ে গেছেন। ভক্ত ও ভগবানের অবাধ ও অসঙ্কুচিত মিলন এই অবতারেই আমরা প্রথম সন্দর্শন করলাম। এমন দয়ার অবতার, এমন করুণার অবতার কখনো হয়নি, আর হবেও না। নরোত্তম দাসের প্রার্থনায় তাই ঝঙ্কৃত হয়েছে :

এমন দয়াল ঠাকুর হয় নাই হবে নাই।
কি সাধনে তাঁহার চরণে স্থান পাই॥

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড

লীলা কাহিনী

গৌরলীলা দরশনে. বাঞ্ছা হয় মনে মনে.
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥

॥ এক ॥

নবদ্বীপের সে এক মহা দুর্দিন।

বিদ্বান-পণ্ডিতের দেশ নবদ্বীপ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ভক্তিধর্ম।

নব্য ন্যায়ের পীঠস্থান তখন এই নবদ্বীপ। নৈয়ায়িকরা ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁদের শিষ্যরাও এইভাবেই চলতেন। বিদ্যা-বুদ্ধি ও জাতি-কুলের গর্বটাই তখন বড়ো হয়ে উঠেছে। ধর্ম যেন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত। যাঁরা ভাগবতাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন, তাঁদের অন্তরও ভক্তিশূন্য। নবদ্বীপ, শান্তিপুর সর্বত্রই অধর্মের অভ্যুত্থান। কোথাও ভক্তির লেশমাত্র নেই। অসার পাণ্ডিত্য গর্বে সবাই স্ফীত, উদ্ধত।

ধর্মের এই গ্লানি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুকে বড় বেজেছিল। তিনি অদ্বৈতাচার্য। গৌর-লীলার মূলাধার পুরুষ। কে এই অদ্বৈত?

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান॥
কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহাধন্য।
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য॥
তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা।
জগতের পূজ্যা, যেঁহো অদ্বৈতের মাতা॥
দোঁহে শান্তিপুরে আসি' গঙ্গা-সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে॥[১]

এই কুবের পণ্ডিত ও তাঁর সহধর্মিণী দুজনেই বৈষ্ণবের নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁদের জীবন রক্ষা হয়। তারপর নিদ্রাকালে তাঁরা একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন :

১ ভক্তিরত্নাকর : নরহরি চক্রবর্তী।

মহাতেজোময় এক পুরুষ সুন্দর।
তপ্তহেম-পর্বত জিনিয়া কলেবর॥
এ পুরুষ আর এক পুরুষ-সুন্দরে।
সুমধুর বাক্য কহে ধরি' দুই করে॥
'কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে।
শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও পৃথিবীতে॥
তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব।
অগ্রজের সহ শীঘ্র প্রকট হইব।'[১]

এই স্বপ্ন দেখে কুবের পণ্ডিত পুলকিত হন। তিনি মহাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিচার করে বুঝলেন, 'গুরুরূপে ঈশ্বরের প্রকট কলিতে।' যথা সময়ে অদ্বৈত প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বহু যত্নে ছেলেকে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করালেন। সর্বচিত্ত-আকর্ষণকারী কুবেরনন্দন শান্তিপুরে থাকতেন, কখনো নবদ্বীপে এসে সমমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতেন। একমাত্র কৃষ্ণ-আলোচনায় তাঁর দিনাতিপাত হতো। তারপর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, তিনি গয়াতে গিয়ে পিতৃ-কৃত্য সমাপন করে, সব তীর্থ ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে শক্তি কা'র ?
করয়ে ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে।
দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে॥
সর্বত্র দর্শন করি' আইল বৃন্দাবনে।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিল যতনে॥
ফল মূল দুগ্ধ কিছু করয়ে আহার।
অদ্বৈতের তেজ দেখি' লোকে চমৎকার॥
প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জন।
'কৃষ্ণে কি দেখিব ?' বলি করয়ে ক্রন্দন॥[২]

১,২ ভক্তিরত্নাকর : নরহরি চক্রবর্তী।

তারপর কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় আসন্ন বুঝতে পেরে, তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এলেন নবদ্বীপে, কারণ তিনি জেনেছেন যে, 'নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।' দেখলেন সবাই বিদ্যা-কুলের দম্ভ নিয়ে কৃষ্ণবিমুখ হয়ে দিনাতিপাত করছে। সবাই বিষয়-সুখে আকণ্ঠ ডুবে আছে। নবদ্বীপে এসে, জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু, কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যানে পটু অদ্বৈত দেখলেন :

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেঁহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥[১]

এইসব দেখে শুনে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে অদ্বৈতাচার্য প্রতিদিন গোবিন্দের চরণে তুলসী অর্পণ করতেন আর বলতেন :

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙে হেথাই॥
আনিব বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সব জীব উদ্ধারিয়া॥[২]

এইভাবে তাঁর অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে তিনি সর্বদা হুঙ্কার ও তর্জন করতেন। অদ্বৈতসিংহের হুঙ্কার বৈকুণ্ঠে গিয়ে পৌঁছল, চঞ্চল হলেন বৈকুণ্ঠনাথ। তারপর চৌদ্দ শ সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে নামরূপী ভগবান হরিনাম মুখরিত নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হলেন দরিদ্র জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে লীলা পুরুষোত্তম।

এখানে একটি নিগূঢ় কথা আছে।

ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।

১,২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নিজ নিত্যপ্রিয় পরিকরের আসন ছাড়া তিনি কোথাও মানুষের দৃষ্টি গোচরীভূত হন না। একজনের ব্যাকুল আর্তিতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে দর্শন দেন। সর্বজনের দর্শনের পথে উপস্থিত হন না সহজে, সামান্য কারণে। সকল ভক্তের ব্যথা, সকল জীবের হৃদয়ের বেদনা যদি কোন একজনে মূর্তি লাভ করে, তবে তাঁর কাতর প্রার্থনায় সকলের জন্য আসতে পারেন। এইরূপ একজন বাস করতেন গৌড় দেশে গঙ্গাকূলে। কলিহত সকল জীবের বেদনাকে তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন। মানুষটির নাম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

জীবের জন্য অদ্বৈত প্রভুর অন্তর কেঁদেছিল।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মরজগতে আনাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন :

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥[১]

শ্রীকৃষ্ণকে সবাইকে দেখাতে না পারলে আমার নাম ব্যর্থ— এইরকম অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা কেউ কোথাও শোনেনি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণগুলি হয়ত অনেকদিন যাবৎ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অন্তরঙ্গ পার্ষদ অদ্বৈতচন্দ্রের কাতর আহ্বান না আসা পর্যন্ত তাঁর অবতরণ করবার সংকল্প সুদৃঢ় হতে পারে নি। সুতরাং প্রিয় পার্ষদের প্রার্থনা ভগবানের দিব্য আবির্ভাবের পক্ষে অপরিহার্য হেতু।

নবদ্বীপ সাধারণ তীর্থস্থান নয়।

মহাপ্রভুর লীলাস্থলী নবদ্বীপ নিত্য চিন্ময় ধাম।

এই নিত্যধামেই গৌরগোবিন্দের নিত্য বিলাস।

বৈষ্ণব মহাজনগণ নবদ্বীপকে ভক্তিব্রজ নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের চক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীব্রজ আর শ্রীধাম নবদ্বীপ ভক্তিব্রজ। আবার কেউ কেউ গুপ্তবৃন্দাবন আখ্যাও দিয়েছেন। অপূর্ব সৌন্দর্যময় এই নব বৃন্দাবনের মহিমা ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লক্ষ স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোকে নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থে কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥[১]

মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ ধাম সেদিন সত্যিই ছিল সর্বসম্পদযুক্ত, প্রেমানন্দ-বর্ধনকারী, ব্রহ্মাদিদেবগণ-বন্দিত এবং নবধাভক্তিভূষণে ভূষিত নিত্য চিন্ময় ধাম। নয়টি দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই নিত্যধাম—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ, কোল দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ। বৈষ্ণব মহাজনদের বিশ্বাস, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবদ্বীপ ধামে নিত্যলীলা করছেন। ভাগ্যবান বৈষ্ণব সাধকগণ এখনো পর্যন্ত সেই লীলা প্রত্যক্ষ করেন:

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥[২]

নবদ্বীপে বাস করতেন জগন্নাথ মিশ্র নামে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ এবং আচারনিষ্ঠ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শচীদেবী তাঁর স্ত্রী। সাক্ষাৎ

১,২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী তিনি। এঁরই গর্ভে গৌর ভগবানের আবির্ভাব হয়। এর আগে তাঁর আটটি কন্যাসন্তান অকালে গর্ভেই বিনষ্ট হয়েছে। নবম সন্তান বিশ্বরূপ। কিন্তু সংসার বা শচীমাতা শত বাহু মেলেও বিশ্বরূপকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ষোল বছরের সুন্দর কিশোর সর্বদা ব্রহ্মবিদ্যা রসে তন্ময় হয়ে থাকতেন। শচীদেবীর মাতৃহৃদয় সেজন্য আর একটি পুত্র-সন্তান লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মিশ্র পুরন্দরের মনের আকাঙ্ক্ষাও একই খাতে বইত। একদিন নিত্য পূজা-অর্চনার পর তিনি স্ত্রীকে একান্তে ডেকে বললেন :

আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়॥[১]

ক্রমে মিশ্র পত্নীর দশ মাস গর্ভকাল অতীত হতে চলল।

তাঁর অঙ্গকান্তি দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে।

কিন্তু সকলেই বিশেষ চিন্তিত হলেন।

ক্রমে এগার মাস পূর্ণ হলো। মিশ্রের মনে জাগে সন্দেহ। এই সময়ে একদিন অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর থেকে এসে মিশ্র পত্নীকে দেখে গেছেন এবং তাঁর গর্ভের উদ্দেশে প্রণাম করেছেন, তবে শচীমাতাকে প্রণাম করেন নি। এই সময়ে মিশ্র-পত্নী সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন করতেন। চৈতন্যমঙ্গলের কবি বলেছেন :

সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পরে॥

দিন যায়। মাস যায়। সবাই উৎকণ্ঠিত। দ্বাদশ মাসও গত হতে চললো, তব প্রসবের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। মনে আশঙ্কা জাগে। মিশ্র সংবাদ পাঠালেন নীলাম্বর চক্রবর্তীকে। তিনি শচীদেবীর পিতা। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। তিনি গণনা করে দেখলেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হবে ত্রয়োদশ মাসে।

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হইল ত্রাস॥

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলেন গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হইবে শুভক্ষণ পাইয়া ॥[১]

সেই শুভক্ষণ এলো ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে। সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। নদীয়াবাসী নরনারী সকলেই শ্রাদ্ধ তর্পণ, পুরশ্চরণাদি ধর্ম কর্ম করবার উদ্দেশে চলেছেন গঙ্গার তীরে। নদীয়ার পথে লক্ষ কণ্ঠে উঠেছে হরিধ্বনি। সবাই চলছেন গ্রহণের স্নান করতে। শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের মঙ্গল ধ্বনিতে নদীয়ার প্রতিটি গৃহ পূর্ণ। চারিদিক দিব্য গন্ধে আমোদিত। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। ঘন ঘন হরিধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত। সকলের মুখেই ভুবনমঙ্গল হরিনাম।

কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
হরি বল হরি বল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
হেন হরিধ্বনি হইল সর্ব নদীয়ায় ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥[২]

সন্ধ্যাকাল সমাগত। অপূর্ব চন্দ্রগ্রহণ নদীয়াবাসীর নয়নগোচর হয়। অমনি বেজে ওঠে হাজার হাজার শাঁখ, তার সঙ্গে ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনি। আকাশ ভরে যায় হরিধ্বনিতে পরিপূরিত হয় চারিদিক দিব্য গন্ধে। সেই শুভ মুহূর্তে যুগধর্ম হরিসংকীর্তন সঙ্গে করে সংকীর্তন যজ্ঞেশ্বর অবতীর্ণ হলেন নদীয়াধামে। সকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ রাহুগ্রস্ত হলো, উদিত হলেন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র নদীয়া ধামে। আকাশের চাঁদ যেন লজ্জায় মুখ লুকালো। চাঁদের মনের দুঃখ বুঝে, রাহু তাঁকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখলো। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের অপরূপ রূপরাশি দেখে, পূর্ণিমার চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে ধীরে ধীরে মুখ লুকায়। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখেছেন .

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥[১]

অন্তরীক্ষে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দিব্যযানে তাঁরা এসেছেন নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করতে। নদীয়ার পথে, ঘাটে, গৃহে, কন্দরে আজ একমাত্র ভুবনমঙ্গল হরিধ্বনি ভিন্ন অন্য শব্দ নেই। আবালবৃদ্ধবনিতা গঙ্গাতীর থেকে দক্ষিণপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী শচীদেবী তের মাসে পুত্র প্রসব করেছেন। নবজাত-শিশুর রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত হয়েছে। এমন রূপের ছেলে কেউ কখনো দেখেনি—যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই বলতে বলতে সবাই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সেই উল্লসিত জনতার মধ্যে আছেন মিশ্রের প্রিয়বন্ধু, পরমকৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিত আর তাঁর স্ত্রী মালিনীদেবী। আজ জগন্নাথের গৃহে অগণিত লোক সমাগম হয়েছে। গ্রহণের স্নান সেরে সবাই নবদ্বীপের দক্ষিণপাড়া হয়ে ঘরে ফিরলেন। নবদ্বীপের সকল পথই লোকে লোকারণ্য। চারদিকে আনন্দ-কোলাহল। জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তাঁর এই নবজাতককে কেন্দ্র করে এমন অগণিত লোকের সমাগম হবে তাঁর গৃহে—এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

কেউ বলে মিশ্র এক অপূর্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্ররত্ন লাভ করেছেন। আবার কেউ বলে, সাক্ষাৎ নারায়ণ এসে তাঁর গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তো সূতিকাগৃহে শিশু গৌরাঙ্গকে দেখে প্রেমানন্দে গদ্‌গদ হয়ে সূতিকাদ্বারে দাঁড়িয়েই স্তব আরম্ভ করলেন:

জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী
রাম নারায়ণ ব্রহ্ম মুকুন্দ মুরারী ॥[২]

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অন্যদিকে নীলাম্বর চক্রবর্তী দেখলেন, তাঁর কন্যার গর্ভে সর্বসুলক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিয়ে নবজাত শিশুর কোষ্ঠীফল গণনা করতে বসলেন। গণনা করে দেখলেন, প্রতি লগ্নে নবজাত শিশুর অদ্ভুত মহারাজ লক্ষণ সব দেখা যাচ্ছে। তাঁর হর্ষ ও বিস্ময়ের যেন সীমা পরিসীমা নেই। আর এই ছেলে বৃহস্পতিতুল্য বিদ্বান হবে, অল্প বয়সে সকল গুণের আকর হবে।

ঠিক সেই সময়ে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নীলাম্বরের গণনায় তাঁর মন ভরল না। তিনি নিজে গণনা করে যা দেখলেন, সকলের সামনেই উচ্চকণ্ঠে তা বললেন : "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ, ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।" সবাই স্তম্ভিত হয় এই কথা শুনে। পুলকিত হন মিশ্র দম্পতি। কে এই অজ্ঞাতকুলশীল বিপ্র? নীলাম্বর চক্রবর্তী বিস্মিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করেন। এই বিপ্র স্বয়ং বৃহস্পতিদেব। এই সব কথা ঘোষণা করেই তিনি লোক সংঘট্টের মধ্যে মিলিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। যেমন আকস্মিক ছিল তাঁর প্রবেশ তেমনি আকস্মিক ছিল তাঁর প্রস্থান। কিন্তু বিপ্র সবাইকে শুনিয়ে গেলেন মিশ্রগৃহে নবজাতকের নিগূঢ় পরিচয় এবং বহু-প্রতীক্ষিত দেবা আবির্ভাবের শুভ সংবাদ যা শুনে নবদ্বীপের নরনারীবৃন্দ যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত হয়। সেদিন, সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, ইতিহাসের গর্ভ স্পন্দিত করেই ঘটেছিল এই আবির্ভাব। বাঙালীর ঘরে এলেন, বাঙালী হৃদয়ের অমিয় মন্থন করে, প্রেমঘন বিগ্রহ এক যুগের মানুষ।

॥ দুই ॥

পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বলেছেন : 'গোরা রূপের নাহিক তুলনা

যে দেখে সেই বলে, এমন ভুবন-আলো-করা রূপরাশি নিয়ে আর কোন শিশু কখনও জন্মগ্রহণ করে নি। শচীমাতার কোলে

যেন একটি চাঁদের উদয় হয়েছে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর, এমন সর্ব সুলক্ষণযুক্ত ছেলে কোন মানবীর গর্ভে জন্মায় না। শিশু গৌরাঙ্গকে নদীয়াবাসী নরনারী যতবার দেখে ততই বেড়ে ওঠে তাদের রূপতৃষ্ণা। সেই কাঁচা সোনার রঙ বিশিষ্ট শিশুর প্রতি অঙ্গের শোভা দেখে চোখ ফেরানো যায় না—সে শোভার বর্ণনা করবার ভাষা নেই।

সেই জগৎ আলো-করা-অপরূপ রূপরাশি শুধু দেখবার জিনিস, দেখে চোখ জুড়াবার জিনিস, ভাষায় বোঝাবার জিনিস নয়। সেরূপের অনুভূতি হৃদয়ে হয় না, এমন কি মনশ্চক্ষে হয় না। তাই বুঝি লোচন দাস লিখলেন

কত চান্দ উদয় দেখিয়া মুখখানি
প্রফুল্ল কমল দল নয়ান বাখানি
উন্নত নাসিকা তিল কুসুম জিনিঞা।
ঝলমল গোরা অঙ্গ কনক অমিঞা।
আর অরুণ আর চারু গণ্ড জিনিঞা
সুন্দর শ্রীবুক দেখি উঠয়ে পিরীত
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ পদ্ম করময়।
বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর সম
অরুণ কমলদল চরণ যুগল [1]

প্রভুর জন্মদিনের রাতটি [illegible] জমজমা ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর পত্নী মালিনীদেবী সারারাত সেখানে রইলেন। রইবেনই তো; কারণ তাঁদের বুঝতে বাকী রইল না যে, শচীর কোলে এসেছেন তাঁদেরই অভীষ্ট দেবতা। শ্রীবাসের অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবীর প্রিয়বান্ধবা মালিনীদেবী, তিনিই তখন উদ্যোগী হয়ে শিশুর জাতকর্মাদি করালেন। বালক বিশ্বরূপ এসে মাকে বলে, ভাইকে মা কোলে নেব একটিবার। পুত্রকে একটি স্নেহচুম্বন দান করে, শচীদেবী বলেন, পাগল ছেলে! ষষ্ঠীপুজোর

১ চৈতন্যমঙ্গল

পর খোকাকে তোর কোলে দেব। মায়ের কোলে শায়িত ভাইটিকে একটু তফাত থেকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে দেখে বিশ্বরূপ চলে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকালে তাঁর অগ্রজের বয়স ছিল আট বছর। বিশ্বরূপেরও রূপের অবধি নেই। ভাই হয়েছে শুনে তার আনন্দেরও সীমা-পরিসীমা নেই।

জন্মদিনের পর দিন।

যথারীতি শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করলেন মিশ্র নবজাতকের মঙ্গলকামনায়।

নীলাম্বর চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি এই শুভকার্যের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীবাস কণ্ঠে তাঁর অভীষ্টদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত হয় এই প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এ কী কাণ্ড! বন্ধু যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন শিশুকে এই দেখে জগন্নাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করেন—পণ্ডিত! তুমি নবজাত শিশুকে প্রণাম করলে কেন?

—মিশ্র! আমি তোমার এই ছেলেকে প্রণাম করি নি। শিশুকে দেখেই আমার মনে পড়ল নন্দনন্দনের বালমূর্তি; তাই তাঁরই উদ্দেশে প্রণাম করলাম।

—পণ্ডিত! একে তুমি আশীর্বাদ কর, যেন চিরজীবী হয়; দেবদ্বিজে যেন এর অচলা ভাব ভক্তি হয়।

—মিশ্র! তোমার এই ছেলে জগৎকে শেখাবে ভক্তিতত্ত্ব। একে তুমি সামান্য শিশু মনে করো না।

নবদ্বীপের এই অবস্থা। ওদিকে শান্তিপুরনাথ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিজগৃহে বসেই নবদ্বীপচন্দ্রের অবির্ভাব ধ্যানে দর্শন করে, প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে নাচছিলেন। নাচছিলেন আর মনে মনে বলছিলেন, গোবিন্দের চরণে আমার নিত্য তুলসী দেওয়া সার্থক

হলো। হরিদাস ঠাকুর তখন তাঁর কাছে শান্তিপুরে ছিলেন। ইনি সেই যবন হরিদাস যিনি প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ না করে জলগ্রহণ করতেন না। অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস সকলেই এই মহা আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। হরিদাস তাঁর গৃহে আসতেই অদ্বৈত তাঁকে নিয়ে প্রেমানন্দে নৃত্যাবেশে ঘন ঘন প্রবল হুঙ্কার করে কীর্তনরঙ্গে মাতিয়ে তুললেন শান্তিপুরধাম।

অদ্বৈতের এত আনন্দ কেন?

এত নৃত্য, এত প্রেমবিহ্বলভাব কেন?

হরিদাস ঠাকুর সর্বজ্ঞ, সবই তিনি জানেন।

তাঁরো আজ আনন্দের সীমা নেই।

গৌর-কৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এজন্যই তাঁদের আজ এত আনন্দ। তাদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার আজ অবসান হলো।

নবদ্বীপে যেমন, শান্তিপুরেও তেমনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার সেই সন্ধ্যায় সেই একই আনন্দ-দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। সংকীর্তন করতে করতে সবাই ছুটেছে সুরধুনীতীরে। কীর্তনের পুরোভাগে রয়েছেন গৌর-আনা গোসাই অদ্বৈত আচার্য। আজ তাঁর অভীষ্টদেব কলিহত জীবের উদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ হয়েছেন নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে। এই শুভ সংবাদ যেন মুহূর্তমধ্যে নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরে প্রচারিত হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের সেই রাতে শান্তিপুরের প্রতিটি গৃহে পুরনারীরা মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে, হুলুধ্বনি দিয়ে শচী-নন্দনের কল্যাণ প্রার্থনা করলেন।

পরের দিন। সে আর এক অভিনব দৃশ্য।

মিশ্রগৃহে এই নবজাতককে দেখবার জন্য শান্তিপুরের নরনারী নবদ্বীপে যাত্রা করলো। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে নদীয়ায় চললেন। সীতাদেবী শচীদেবীর সমান বয়সী ছিলেন। দুজনে বিশেষ সম্প্রীতি। দুজনে একাত্মা, এক প্রাণ। নবদ্বীপে গেলেই সীতাদেবী তাঁর বান্ধবীর সঙ্গ ছাড়তেন না। শচীদেবীর নির্দেশেই শান্তিপুরে এই শুভ সংবাদ—তাঁর একটি পুত্রলাভ হয়েছে—দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছিল সীতাদেবীর কাছে। তিনি কিন্তু শূন্য

হাতে বান্ধবীর পুত্রমুখ দেখতে এলেন না। বস্ত্রালঙ্কার, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সব বেঁধে একটি ঝাঁপির মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিলেন। অদ্বৈতের সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না।

যথা সময়ে সীতাদেবীর দোলা নবদ্বীপে এসে পৌছল। তিনি একাই এসেছিলেন, অদ্বৈতপ্রভু এ যাত্রায় পত্নীর সঙ্গী ছিলেন না। তবে শান্তিপুরের হাজার হাজার নরনারী সীতাদেবীর সঙ্গে নবদ্বীপে এসেছিল মিশ্র দম্পতির নবজাত শিশুকে দর্শন করতে। শচী-আঙিনায় দাঁড়াতেই সীতাদেবীকে দেখবামাত্র কোথা থেকে বালক বিশ্বরূপ এসে তাঁকে বলে, জ্যাঠাইমা! তুমি আমাদের রাঙা খোকাকে দেখতে এসেছ? ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে না তো?

বিশ্বরূপকে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন সীতাদেবী। শত শতবার মুখচুম্বন করলেন। আঁচলে বেঁধে তার জন্য মিষ্টি এনেছিলেন। আঁচল থেকে তা খুলে বিশ্বরূপের দুই হাতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, হাঁরে! তোর চেয়েও কি তোদের এই খোকা সুন্দর হয়েছে?

—সুন্দর? কি বলছ জ্যাঠাইমা? আমি তো ওর কাছে কালো। তুমি গিয়ে দেখ না?

এই বলে সীতাদেবীর হাত ধরে টেনে বালক তাঁকে সূতিকা-গৃহের দিকে নিয়ে চললো। অদ্বৈত-গৃহিণী জানতেন, বান্ধবীর আটটি কন্যা-সন্তান গর্ভে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাছে এই নবজাতকের কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সকলের আগে আঁতুড়ঘরের দরজায় একটি মুড়ো ঝাটা টাঙালেন। কাঁটাসেজের গাছে সিঁদুর লাগিয়ে গোবর-পিণ্ডের ওপর পুঁতে আঁতুড়ঘরের ওপর রাখলেন। স্বামীর কাছ থেকে শিশুর জন্য মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ এনেছেন। সেটি শিশু গৌরাঙ্গের বুকে লাল সুতোর ডোর বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। শিশুর নিমাই নাম রেখেছিলেন সীতাদেবী।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'দিন বাদে, নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় আঁতুড়-ঘরের দরজায় গৃহদেবতার পূজা হলো। ব্রাহ্মণদের পদরজে অনুষ্ঠিত হয় শিশু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলাচরণ। এই পূজার সকল আয়োজন

করেছিলেন সীতাদেবী ও মালিনীদেবী। শ্রীবাস পণ্ডিত, নীলাম্বর চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি সবাই উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেশিনী পুরনারীদের সবাই এসেছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী কন্যাকে ঠাকুরের চরণামৃত দিলেন। সেই চরণামৃত ছেলের মুখে ও মাথায় দিয়ে শচীদেবী বলেন, ঠাকুর! ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে রেখ। পুরনারীদের বিতরণ করা হলো তেল-হলুদ, পান-সুপারী ও মিষ্টান্ন। সবাই আনন্দিত মনে শিশুকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

॥ তিন ॥

সীতাদেবী নাম রাখলেন নিমাই।

কিন্তু শুধু ঐ নামে শচীদেবীর মন ভরে না।

নিমাইচাঁদ—এই বলে শিশুকে কেউ না ডাকলে তিনি খুশি হতেন না। সবাইকেই বলতেন, নিমাই আমার চাঁদ। আমি ওর মুখে চাঁদের হাসি দেখতে পাই। ওর সমস্ত শরীরটা যে চাঁদের সুধা দিয়ে তৈরি। শচীর বড় আদরের নাম নিমাইচাঁদ।

সবাই তাই নিমাইচাঁদ বলে ডাকে, কেউ আর এখন খোকা বলে না। দিনে দিনে সকলের চিত্ত হরণ করতে লাগল নিমাই। ছেলে যেই একটু কাঁদে অমনি হরিনাম করলেই কান্না থেমে যায়। সুন্দর মুখের কোণে ফুটে ওঠে হাসির রেখা সবাই আশ্চর্য হয়। এই দিব্য-সংকেত প্রথমে বুঝেছিলেন শচীমাতা—পরে তিনি সবাইকে বোঝালেন ও শেখালেন।

তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবাই লয়েন॥

আনন্দে করেন সবে হরিসংকীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হইল নদীয়া ভবন॥[১]

দেখতে দেখতে ছেলে তিন মাসের হলো। সেই সময় একদিন একটি মজার কাণ্ড দেখে মিশ্র-দম্পতির বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। বাড়ির মধ্যে এখানে ওখানে ছোট-ছোট পায়ের ছাপ। সাধারণ ছাপ নয়—একেবারে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন সমেত ছাপ। এমন ছাপ তাঁরা আগে কখনো দেখেন নি। মিশ্র মনে করলেন, গৃহে বালগোপাল বিগ্রহ আছেন, নিত্য তাঁর পূজা-অর্চনা হয়। তিনি খুব জাগ্রত দেবতা। হয়ত তিনিই অলক্ষিতে গৃহমধ্যে বিহার করেন। নইলে এমন পায়ের ছাপ তো মানুষের হতে পারে না। শচীদেবীও এই ছাপ দেখেছেন।

স্বামী-স্ত্রীর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি এমন সময়ে শয়নে নিদ্রিত শিশু কেঁদে ওঠে। শচীমাতা তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে স্তন্যপান করাতে বসলেন। হঠাৎ শিশুর রাঙা পায়ের তলার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ঘরের মধ্যে তিনি যেরকম ছাপ দেখেছিলেন, ছেলের পায়ের তলায়ও হুবহু সেইসব শুভ চিহ্ন দেখতে পেলেন তিনি। যারপরনাই বিস্মিত হলেন। স্বামীকে ডেকে বলেন, ঐ দেখ, আমার নিমাইচাঁদের ছোট্ট রাঙা পায়ের চিহ্নগুলোও ঠিক ঐ রকম। তুমি ভাল করে দেখ দেখি।

তারপর স্বামী স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলের রাঙা পা দুটি চোখের কাছে ধরে দেখতে থাকেন। হাঁ—ঐসব শুভ চিহ্নলাঞ্ছিত দুটি চরণ। জগন্নাথ মিশ্র একটি একটি করে চিহ্নগুলি মিলিয়ে দেখেন—সেই ধ্বজচক্র, শঙ্খচক্র পতাকা, মীন প্রভৃতি সব চিহ্নই শিশুর দুটি পায়ের তলায় আঁকা রয়েছে। শিহরণ জাগে পিতার দেহমনে আর পুলকিত হয়ে ওঠে মায়ের সারা অন্তর। মিশ্রের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত।

বিষয়টা এখন কানাকানি করা উচিত হবে না, ভাবলেন দুজনে। স্ত্রীর কথামত নীলাম্বর চক্রবর্তীকে গোপনে ডাকতে গেলেন মিশ্র।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তিনি আসতেই শচীদেবী ছলছল চক্ষে, রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, বাবা! আমার নিমাইচাঁদের পায়ে এসব কি চিহ্ন দেখছি? এজন্য আমার মনে বড় আশঙ্কা হয়েছে। মেয়ের কাছে বসে শিশুর রাঙা পা দুটি তাঁর চোখের খুব কাছে এনে বেশ করে দেখলেন। তারপর বিহ্বল কণ্ঠে বলে ফেললেন—এর হাতে-পায়ে নারায়ণের চিহ্ন। এই শিশু সকলকে উদ্ধার করবে।

—বাবা! এ আপনি কি বলছেন? নিমাইচাঁদ আমার দুধের ছেলে, তাকে নারায়ণ বললেন, সে সকলের উদ্ধার করবে, এ কি কথার মতো কথা? আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার দেখছি বুদ্ধিভ্রম হয়েছে। নীলাম্বর চক্রবর্তীর তখন হুঁস হয়। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে মেয়েকে বলেন, তোর নিমাই সুলক্ষণযুক্ত শিশু। এ খুব হরিভক্ত হবে। এর সুধামুখের হরিনাম শুনে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। তখন বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে ছেলের মাথায় দিয়ে শচীদেবী বলেন, বাবা! আমার কথায় রাগ করবেন না। নিমাই-চাঁদকে আশীর্বাদ করুন, সে যেন চিরজীবী হয়। তিন মাস বয়সের সময় পিতামাতাকে এই ঐশ্বর্য দেখিয়েছিলেন গৌরহরি।

যথাকালে শুভ অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হলো।

নদীয়ার সকল নরনারী তা জানলেন।

মিশ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোথা থেকে সকল ব্যবস্থা হয়ে গেল তা তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। এই শুভ অনুষ্ঠানের কর্তা হলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। সকলেই নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার এনে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে একে একে পৌঁছতে লাগলেন। শান্তিপুর থেকে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন সীতাদেবী। তিনিই ভাণ্ডারী হলেন আর তাঁকে সহায়তা করতে লাগলেন মালিনীদেবী। পুরনারীগণ অযাচিতভাবে এই শুভ কাজে যোগ দিলেন। মিশ্র ভবনে নিমাইচাঁদের শুভ অন্নপ্রাশনের ধুমধাম পড়ে গেল।

অদ্বৈত-গৃহিণী মনের সাধে শিশু-গৌরকে নতুন অলঙ্কার-বস্ত্রে

সাজিয়ে দিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধান করে ছেলেকে কোলে করে শচীদেবী যজ্ঞস্থলে বসলেন। শুভ লগ্নে শুরু হয় অন্নপ্রাশন। ঘৃত প্রসাদী অন্ন প্রদান করলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী দৌহিত্রের মুখকমলে। তারপর যেখানে বিবিধ দ্রব্য—ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রূপা প্রভৃতি সাজানো ছিল মিশ্র ছেলেকে কোলে করে সেখানে নিয়ে এলেন। বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই গ্রহণ কর।

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥[১]

এ ছেলে খুব পণ্ডিত হবে, একবাক্যে বললেন শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণগণ। নাম রাখা হলো 'শ্রীবিশ্বম্ভর'। বিশ্বরূপের ভাই বিশ্বম্ভর। এ নাম ভগবানের নাম। নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর কোষ্ঠীফল গুণে এই নাম রাখতে বললেন। এই নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ধরিল ভরিল ভূতগ্রাম ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ-পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥[২]

দেখতে দেখতে বিশ্বম্ভরের বয়স পাঁচ বছর হলো।

একটা ভাল দিন দেখে জগন্নাথ মিশ্র তাঁর হাতেখড়ি দিলেন।

পট্টবস্ত্র পরিহিত নিমাইচাঁদের ডান হাতটি ধরে জগন্নাথ মিশ্র মাটিতে খড়ি দিয়ে ছেলেকে অ আ ক খ লেখালেন। আধ-আধ ভাষে ছেলে যখন ক খ গ ঘ বললো, তখন তা যে কি সুন্দর শোনালো তাঁর কানে তা শুধু তিনিই জানলেন। নীলাম্বর, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন—তারাও সেই মধুর কণ্ঠে আধ-আধ স্বরে উচ্চারিত ক খ গ ঘ শুনে পুলকিত হলেন।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।
তাই শুনিতেই মাত্র সর্বজীব ভোলে ॥[১]

সমাগত সবলকেই শচীদেবী আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট করলেন। বিশ্বরূপ সেদিন বাড়িতেই ছিলো। বাবার কাছে বসে ছোট ভাইটিকে আদর করে বর্ণমালা শেখায়।

নবদ্বীপের সুদর্শন পণ্ডিত মিশ্রবাড়ির কুলপুরোহিত। তাঁদের উপাধি ওঝা। তিনিও এই শুভকার্যে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একটি পাঠশালা আছে। নবদ্বীপের ছেলেরা সেই পাঠশালায় প্রথম লেখাপড়া আরম্ভ করে। সুদর্শন পণ্ডিতকে তাই সবাই গুরু-মশাই বলে ডাকতো। আর একজন গুরুমশাই ছিলেন নবদ্বীপে। নাম তাঁর বিষ্ণু পণ্ডিত। মিশ্র তাঁর ছেলের লেখাপড়ার ভার এই দুই পণ্ডিতের হাতে দিলেন।

অসাধারণ মেধাবী বালক।

অল্পদিনের মধ্যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সব শিখে ফেললেন।

একদিনেই সব অক্ষর লিখতে শিখলেন।

লেখাপড়া করে বাবার কাছে প্রথমেই কৃষ্ণনাম লিখতে শিখলেন। তালপাতায় কঞ্চির কলম দিয়ে বড় বড় করে রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি নামগুলি লেখেন দিনরাত। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ শচীনন্দনের।

দিন দুই তিনে লিখলেন সর্বফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥
রাম কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী ॥[২]

পাড়ার সমবয়সী ছেলেরাও বিশ্বম্ভরের কাছে এসে লিখতে বসবে। কি লেখাপড়ায়, কি বুদ্ধিতে নিমাই-এর মতো কেউ নয়। তাঁর পাঠশালায় পড়ার একটি কাহিনী জয়ানন্দ তাঁর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখে গেছেন। একদিন সকালে সহপাঠীদের সঙ্গে নিমাই গেলেন

১,২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ি। পাঠশালায় গিয়ে প্রথমেই তিনি দেখছেন, ক, খ, প্রভৃতি চৌত্রিশ অক্ষর একটি কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে। সুদর্শন পণ্ডিত সেখানে বসে আছেন। তাঁর পত্নীও সেখানে আছেন। গুরুমাকে প্রণাম করে, এলেন তিনি গুরুমশাইয়ের কাছে। তাঁকে বলেন—আজ থেকে সবাইকে শুধু 'ক' পড়াবেন। সুদর্শন পণ্ডিত তো অবাক্। অবাক্ নদীয়ার সর্বলোক। বালক হলেও এ যে বিজ্ঞের মতো কথা। চৈতন্যমঙ্গলের কবি বলেছেন, এইভাবে বিশ্বম্ভর কৌশলে গুরুমশাইকে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হলে শুরু হয় টোলের পড়া। ছাত্র হিসাবে নিমাই যেমন বুদ্ধিমান ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন দুরন্ত। তাঁর দৌরাত্ম্যে সুদর্শন পণ্ডিত অস্থির হতেন ; অস্থির হতেন পাড়ার সবাই। যথাসময়ে তিনি ভর্তি হলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ; পড়তে থাকেন সেখানে কলাপ ব্যাকরণ। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁর জীবনে অনেক ছাত্র পড়িয়েছেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের এই ছেলেটির মতো তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছাত্র তিনি আর একটিও দেখেন নি।

কিন্তু ছেলের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হয়ে ওঠেন শচীমাতা। ছয় বছর বয়সের ছেলে যে এত দুরন্ত হতে পারে তা মিশ্র-গৃহিণী ধারণা করতে পারতেন না। একদিন তিনি বিশ্বরূপকে বলে দিলেন নিমাই-এর দুরন্তপনার কথা। বিশ্বরূপ এখন চৌদ্দ বছরের পরম তেজস্বী বাল-ব্রহ্মচারী। অদ্বৈত প্রভুর টোলে তিনি ভক্তিশাস্ত্র পড়েন। আজন্ম সংসার-বিরক্ত তিনি। সব সময় কৃষ্ণকথা নিয়ে তন্ময় থাকেন। এই বয়সেই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েছেন তিনি। তাঁর রূপের অবধি নেই।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব গুণের নিধান ॥[১]

বিশ্বম্ভর কাউকে ভয় করতেন না। শুধু দাদাকে দেখলে নম্র হতেন। দুই ছেলে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। শচীদেবী বিশ্বরূপকে

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তখন বললেন, তুই ঘরে থাকলে নিমাই আমার কোন দৌরাত্ম্য করে না। এই দেখ, কেমন শান্তশিষ্ট হয়ে তোর পাশে বসে খাচ্ছে। তুই না থাকলে এই খাওয়া নিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলত।

ছেলের আরো কতরকম দুরন্তপনার কাহিনী বললেন শচীদেবী—গঙ্গার ঘাটে অত্যাচার তো নানা রকমের। সবাই এসে নালিশ করে যায় বাড়িতে। সব শুনে বিশ্বরূপ স্নেহভরে অনুজকে বলেন, লেখাপড়া করিস নিমাই, খুব ভালো হয়ে চলিস, মা-বাবার সেবা করিস। আমার তো আর কিছুই হলো না। এইসব কথা বলে, ভাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিশ্বরূপ চলে গেলেন অদ্বৈতের গৃহে। কিন্তু এর কিছুকাল বাদেই মিশ্রের সংসারে নেমে এলো বজ্রাঘাত। বিশ্বরূপ গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। বাবা তাঁকে সংসার-বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করছেন, এই কথা জানতে পেরেই বিশ্বরূপ গৃহের সংকীর্ণ সীমার টান তুচ্ছ করে বিশ্বের পানে চললেন সন্ন্যাস নিয়ে।

মিশ্র-দম্পতির প্রাণে এই আঘাত নিদারুণভাবে বাজল। বালক নিমাই দেখলেন দাদা নেই—যে দাদা তাঁর সকলের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে সুন্দর, মধুর। সত্যি, দাদার এই আকস্মিক গৃহত্যাগে নিমাই শোকে একান্ত অধীর হয়ে পড়লেন। শচীদেবী নিজেকে সংযত করে জীবনের একমাত্র অবলম্বন নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জগন্নাথ মিশ্র বলেন, নিমাই-এর আর পড়ে কাজ নেই। 'মূর্খ হয়ে ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি।' নিমাই-এর পড়া বন্ধ হলো। কিন্তু তাঁর দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে দিন দিন। বাবা তাঁকে লেখাপড়া করতে নিষেধ করেছেন, এজন্য বিশ্বম্ভরের রাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। সেই তাঁর ক্রোধ একদিন ফেটে পড়ল শচীদেবীর ওপর।

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে একটি গর্তে পাড়ার সকল গৃহস্থ উচ্ছিষ্ট ও অশুচি হাঁড়ি ফেলত। সেখানে কেউ যেত না। মাকে রাগাবার জন্য নিমাই একদিন সেই অপবিত্র স্থানে একটি উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির ওপর গিয়ে বসলেন এবং হাসতে থাকেন আর হাঁড়ির কালি নিয়ে দু' হাতে, সারা শরীরে মাখলেন। এতে তাঁর সোনার অঙ্গের অপরূপ

শোভা হলো। তাঁর প্রিয় সঙ্গীরা দূর থেকে পথে দাঁড়িয়ে নিমাইচাঁদের এই কাণ্ড দেখলেন। তাঁদের একজন গিয়ে শচীমাতাকে সংবাদ দিলেন : 'নিমাই বসিয়া আছেন হাণ্ডীর আসনে।' ছেলেকে সেই অপবিত্র স্থানে বসে থাকতে দেখে, কপালে করাঘাত করে তিনি 'হায় হায়' করতে লাগলেন। মা'কে দেখে ছেলের রাগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ক্রুদ্ধ অথচ মধুর কণ্ঠে বলেন :

—তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্বত্র আমারে হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥[১]

শুদ্ধচারিণী শচীদেবী কি করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে ভালো কথায় ছেলেকে আদর করে বলেন, এই যে তুমি নোংরা জায়গায় উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির ওপর বসেছ, সর্বাঙ্গে মেখেছ কালিঝুলি, এখন পবিত্র হবে কি করে?

অমনি গৌর ভগবান হাসতে হাসতে শুচি অশুচির গূঢ় তত্ত্ব মাকে একে একে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন :

প্রভু বোলে মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥
এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলে রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধনস্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেক আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ কারণে॥[২]

ছেলের মুখে এমন গভীর তত্ত্বকথা শুনে এত দুঃখের মধ্যে শচী-

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দেবীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। নিমাই কিন্তু উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপরেই নির্বিকারচিত্তে বসে রইলেন। তাঁর শেষ কথা, যদি তাঁকে পড়তে না দেওয়া হয়, তবে তিনি ঐ গর্ত থেকে উঠবেন না। জগন্নাথ মিশ্র সব শুনলেন। তাঁর মন বদলে যায়। ছেলেকে ডেকে আদর করে বলেন: তুমি কাল থেকে আবার টোলে পড়তে যাবে। নিমাই তখন খুশি হয়ে অশুচি স্থান থেকে উঠে এলেন। পিতাকে বোঝালেন, তিনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছা তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন, পাণ্ডিত্যে জগৎকে চমকিত করবেন।

॥ চার ॥

নিমাই-এর বয়স এখন ন' বছর।

শচীদেবী স্বামীকে বলেন, ছেলের পৈতা দেবার সময় হলো। বামুনের ছেলে, কিন্তু তার দেবতা-ব্রাহ্মণ জ্ঞান নেই, আচার-বিচারের ধার ধারে না। পৈতে হলে দেব-দ্বিজে ভক্তি হবে। একটা ভাল দিন দেখে ছেলের পৈতা দাও।

গৃহিণীর কথা সমীচীন মনে হলো। তখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করে, নিমাইচাঁদের শুভ-উপনয়নের শুভ দিন স্থির করলেন। এই উৎসবে অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি শান্তিপুর থেকে বাল-গৌরাঙ্গের জন্য মনের মতো নানাবিধ সোনার গহনা গড়িয়ে এনেছিলেন। যথাবিধি উপনয়ন হয়ে গেল। তাঁর অপূর্ব বাল-ব্রহ্মচারী বেশ; পরনে গৈরিক বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, হাতে বেলকাঠের দণ্ড সেই দণ্ডের অগ্রভাগে ভিক্ষার ঝুলি। গলায় শুভ্র যজ্ঞসূত্র।

অপূর্ব ব্রহ্মণ্য তেজে গৌর-হরির সর্ব অঙ্গ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সেই ব্রাহ্মণবটু রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। পিতা পুত্রের কানে গায়ত্রী

মন্ত্র দিলেন। তখন ব্রহ্মচারীবেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে যজ্ঞস্থলে দাঁড়ালেন গৌর-হরি। মাকে বললেন, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতঃ।' অমনি চারদিকে জয় জয় ধ্বনি উঠল।

ঝুলি কাঁন্ধে ভিক্ষা মাগে বিস্মিত দেবতা।
রজত কাঞ্চন ভিক্ষা দিল শচীমাতা॥
প্রবাল মৌক্তিক মালা ভিক্ষা দিল মনোহর।
রজত কাঞ্চন দিল মিশ্র পুরন্দর॥[১]

সকলের কাছেই ভিক্ষা করলেন। দাতাদের আনন্দের সীমা নেই। সকলের মুখেই জয়ধ্বনি।

শ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষ।
সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥[২]

ছেলের উপনয়নের ঠিক এক বছর পরে শচীদেবীর সংসারে আর একটি দুর্যোগ দেখা দিল। নিমাই তখন খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করেন, আগের চপলতাও নেই। মিশ্র জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত। গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করলেন তিনি। নিমাই যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সে কথা জেনেও তিনি একদিনের জন্যও পিতৃধর্ম থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হন নি। কত অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা মিশ্র নিজের চক্ষে দেখেছেন, তবু ছেলেকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করেন নি একদিনও। বরং পড়াশুনায় অবহেলা বা চাপল্যের জন্য ভর্ৎসনা, এমনকি প্রহারও করেছেন।

প্রথম যেদিন প্রহার করলেন সেই রাত্রে স্বপ্নে তাঁর সম্মুখে এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, জগন্নাথ! তুমি নির্বোধ, জাননা আজ কার অঙ্গে প্রহার করেছ, তোমার এই পুত্র সামান্য পুত্র নয়। মিশ্র উত্তর দিলেন, ছেলে যেই হোক না কেন, এমনকি নারায়ণ হোক না কেন, আমি পিতৃধর্মই পালন করেছি, আমার কর্তব্য আমাকে যে পালন করতেই হবে। ব্রাহ্মণ পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান করলেন।

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

২ শ্রীচৈতন্যভাগবত

হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে জগন্নাথ মিশ্র অন্তর্জলী হয়ে মহাপ্রয়াণ করবেন। নিমাই তখন গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তিনি অধ্যয়নরত ছিলেন। এই দুঃসংবাদ শোনা মাত্র পুঁথি আছড়িয়ে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে গঙ্গাতীরে ছুটলেন। তারপর নামরূপী নরবিগ্রহ, পুত্ররূপী নিমাই-এর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়েই মিশ্র দেহত্যাগ করলেন। মিশ্র ভবনে গভীর আর্তনাদ উঠল। মাতা-পুত্রের ক্রন্দনে নদীয়ার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হলেন নিমাই।

শচীদেবীর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল।

তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন, তবু শোক-জর্জরিত হৃদয় নিয়ে, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ধৈর্যে বুক বাঁধতে হয়। এখন থেকে তিনি হলেন গৌর-হরির মা এবং পিতা। তাই এখন তাঁর পুত্রসেবা ভিন্ন অন্য কাজ নেই। নিমাই কি করে মানুষ হবে, কেমন করে তার বিদ্যালাভ হবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হলেন। এক দণ্ডের জন্যও তিনি ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারেন না।

দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হয় অন্ধ॥
প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরো যে দুর্লভ লোকে বোলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দেব হেলে॥[১]

দিন যায়।

পিতৃহীন দরিদ্র অসহায় বালকের হাত ধরে শচীমাতা নদীয়ার পণ্ডিতদের দরজায় উপস্থিত হলেন—নিমাইয়ের ভার যেন তাঁরা গ্রহণ করেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা নেই মা আপনার,

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

আমাদের সমস্ত বিদ্যা এর মতো প্রতিভাবান শিষ্যকে উজাড় করে, আমরাই ধন্য হব।

বিদ্যারসে মগ্ন হলেন নিমাই।

পুঁথি আর শাস্ত্রের আলোচনায় দিন-রাতের কত প্রহর যে নিঃশব্দে পার হয়ে যায় তার আর হিসাব থাকে না। ক্রমে বালক কিশোর হলো, কিশোর হলেন তরুণ। অপূর্ব রূপলাবণ্যের প্রভাব সঙ্গে এসে মিশেছে বিদ্যার প্রতিভা। নবদ্বীপের পথ ধরে যখন এই অপূর্ব সুন্দর জ্ঞানদীপ্ত তরুণ চলতে থাকেন তখন নগরীর নয়ন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ শেষ করে নিমাই ন্যায়শাস্ত্র পড়বার জন্য পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে প্রবেশ করলেন।

এই বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা দেশ থেকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে এনে নবদ্বীপে তা প্রচার করেছিলেন। তখন থেকেই নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। দেশবিদেশে তাঁর প্রতিপত্তি হয়। উড়িষ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে পুরুষোত্তমে নিয়ে যান। তাঁকে তিনি রাজপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভু এই বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করে আত্মসাৎ করে নিজ জন করেন। সেই লীলা-কথা যথাস্থানে বলব।

সার্বভৌমের টোলে প্রবীণ পড়ুয়াদের মধ্যে রঘুনাথ নামে একজন ছিলেন। তাঁর মনে বড় আশা ছিল, ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি হবেন ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভা দেখে তাঁর এই বড় আশায় ছাই পড়ল। এক টোলে এক অধ্যাপকের কাছে দুজন পড়েন, তাই রঘুনন্দন এবং নিমাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মনে মনে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরতেন। হিংসার কারণ শচীনন্দনের অপূর্ব প্রতিভা। যে দিনরাত পথে পথে চঞ্চল বালকের মতো খেলে বেড়ায়, টোলে এসে একবার পুঁথি নিয়ে বসলে তার পড়া সম্পূর্ণ হয়—এর রহস্য কি? রঘুনাথের সময় সময় মনে হতো—নিমাই বোধহয় সরস্বতীর বরপুত্র।

ন্যায়শাস্ত্র পড়ার সঙ্গে নিমাই ন্যায়ের একটি টীকা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। রঘুনাথও এই সময়ে ঐ রকম একটি টীকা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই পরস্পরের কাছে বিষয়টি গোপনে রেখেছিলেন—কেউ কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। ন্যায়ের টীকা লেখা খুবই কঠিন। রঘুনাথ পাণ্ডিত্যাভিমানী। তাঁর উচ্চাভিলাষ তিনি জগতে ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন। কিন্তু যেদিন জানতে পারলেন নিমাইও ন্যায়ের একটি টীকা লিখতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন রঘুনাথের সকল আশা নির্মূল হলো। তিনি বিষণ্ণ হলেন।

—নিমাই! তুমি নাকি ন্যায়ের একটা টীকা লিখছ?

—একথা তুমি কি করে জানলে? আমার টীকা লেখা নামমাত্র। কিছু লিখতে আরম্ভ করেছি বটে।

—একবার দেখাতে পারো।

—তা বেশ। কাল সঙ্গে করে টোলে আনব।

পরের দিন। টীকা নিয়ে টোলে এলেন নিমাই। রঘুনাথকে বললেন, আজ নৌকা করে গঙ্গাপার হব, সেই সময়ে তোমাকে আমার টীকা পড়ে শোনাব। দুই বন্ধুতে নৌকা চড়ে, গঙ্গার পরপারে কুলিযা যাত্রা করলেন। সে নৌকায় আর কেউ ছিল না। দুজনেই বিদ্যারসে তন্ময়। নিমাই তাঁর লেখা টীকার পাঠক। শ্রোতা রঘুনাথ। শুনতে শুনতে রঘুনাথের মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয়। তাঁর বিদ্যার গর্ব খর্ব হলো। তিনি যে কথা দশ পাতা লিখেও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি, নিমাই তা মাত্র দু'তিন কথায় অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রঘুনাথ বুঝলেন, এই টীকা প্রচার হলে তাঁর গ্রন্থ কেউ আর পাঠ করবে না। হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে মর্মপীড়িত রঘুনাথ দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। এত শ্রম সব পণ্ডশ্রম হলো।

—রঘুনাথ, কাঁদ কেন?

—বন্ধু! তোমার এই টীকার তুলনায় আমার টীকা অতি তুচ্ছ। ভেবেছিলাম আমার টীকা উত্তম, কিন্তু এখন দেখছি তোমার এই বই থাকতে আমার জীবনের সাধ কখনো পূর্ণ হবে না।

এই কথা বলতে বলতে রঘুনাথের দুই চোখ আবার জলে ভরে উঠলো। তখন বন্ধুর উচ্চাভিলাষ যাতে চরিতার্থ হয়, নিমাই সেইজন্য মুহূর্তমধ্যে মাঝগঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন তাঁর সেই অসামান্য কিন্তু অসমাপ্ত ন্যায়ের টীকা। রঘুনাথ বন্ধুর এই কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত এবং লজ্জিত হলেন। তারপর বন্ধুকে তিনি বললেন, রঘুনাথ! ন্যায়শাস্ত্র পড়ে বা আলোচনা করে পরমার্থ লাভ হয় না। , আমি আজ থেকে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ ছেড়ে দিলাম।

সেদিন নিমাই পণ্ডিতের এই অচিন্তনীয় এবং অকল্পিত স্বার্থ-ত্যাগের কথা তৃতীয়জন কেউ জানতে পারেনি। নদীয়ার লোক জানতেই পারল না মহাপ্রভু কি অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও উদারতা দেখালেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, কলির মানুষকে তিনি সেই শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি তাঁর চরিত্রকে চিরকালের মতো মহিমামণ্ডিত করেছে।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে আর একজন পড়ুয়া ছিলেন মুরারি গুপ্ত। তিনি জাতিতে বৈদ্য, নিমাই অপেক্ষা আট-দশ বছরের বড়। টোলের প্রবীণ ও প্রধান ছাত্র। অধ্যাপকের খুব প্রিয়পাত্র। মুরারির সঙ্গে প্রভু চতুষ্পাঠীতে কত খুঁটিনাটি করতেন, এমনকি তাঁর প্রতি মাঝে মাঝে উপহাস বাক্যও প্রয়োগ করতেন—করতেন কত না রঙ্গ। এই মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে একজন, তাই তাঁর সঙ্গে তিনি এই রকম ব্যবহার করতেন।

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে এক কাণ্ড হলো।

নবীন ও প্রবীণ পড়ুয়া মিশ্রনন্দন ও বৈদ্য মুরারিতে ঘোরতর বিদ্যা-যুদ্ধ হলো। নিমাই-এর মুখমণ্ডলের প্রতিভা ও জ্যোতি দেখে মুরারি গুপ্ত বুঝলেন ইনি মানুষ নন। অন্যদিকে প্রভুও দেখলেন এই বৈদ্য-তনয়ের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য নয়। মুরারির মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে গৌর-হরি আনন্দিত হলেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন। অমনি মুরারির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন :

চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়ে।
প্রকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে॥
এমন পাণ্ডিত্য কি বা মনুষ্যের হয়ে।
হস্ত স্পর্শে দেহ হৈল পরমানন্দময়ে॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞি।
এমন সুবুদ্ধি সর্ব নবদ্বীপে নাঞি॥[১]

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-নাম প্রচারে ইনিই অগ্রণী ছিলেন। ইনি গৌর-লীলা স্বচক্ষে দেখে যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তা 'মুরারি গুপ্তের করচা' নামে অভিহিত। প্রভুর লীলা লেখকগণ মাত্রেই মুরারি গুপ্তের কাছে ঋণী।

এইবার অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের কথা।

তিনি নিজের টোল খুললেন।

তাঁর বয়স এখন ষোল বছর। নবীন যুবক।

নিজের বাড়িতে স্থানাভাব। সেইজন্য মুকুন্দ সঞ্জয় নামে নবদ্বীপের এক ধনী ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে একটি চতুষ্পাঠী খুললেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের ছেলেকে তিনি পড়াতেন। পিতা-পুত্র দুজনেই তাঁর অতি প্রিয় ভক্ত। এই নতুন টোলে অনেক বিদ্যার্থী এসে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্র হলেন। নবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান। হাজার হাজার অধ্যাপক পণ্ডিত চতুষ্পাঠী করে অনেক কাল থেকে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করে আসছেন। মিশ্রনন্দন ষোল বছর বয়সে অধ্যাপকও হয়েছেন। নবদ্বীপে এত কম বয়সের অধ্যাপক এই প্রথম। এই বালক অধ্যাপকের কাছে পরাজিতদের মধ্যে একজন ছিলেন মুকুন্দ দত্ত।

মুকুন্দ পরম বৈষ্ণব। অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। নিমাই ও মুকুন্দ দুজনেই গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে একত্রে পড়তেন।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই কায়স্থ-সন্তান অদ্বৈত-সভায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলগীত গান গেয়ে শ্রোতাদের কাঁদাতেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে নিজ দাস করে নিয়েছেন। নীলাচলে এই মুকুন্দ দত্ত তাঁর দ্বারী হয়েছিলেন। আজীবন তিনি প্রভুর সঙ্গে থেকে তাঁর শ্রীচরণ সেবার অধিকার পেয়েছিলেন। বালক অধ্যাপকের কাছে পরাজিত হয়ে, তিনি সর্বদা মনে মনে চিন্তা করতেন যে, নিমাই পণ্ডিত যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তাহলে বড় সুখের বিষয় হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের নাম ও যশ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। নানা দেশের ছাত্র এসে তাঁর টোলে প্রবেশ করছে। এই সময়ে একদিন গদাধরকে পথে আসতে দেখলেন তিনি। গদাধর ব্রাহ্মণ সন্তান, যেমন রূপবান, তেমন শান্ত স্বভাব। গৌর-হরির প্রিয় বয়স্য। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ শেষ করে গদাধর তখন ন্যায়শাস্ত্র পড়ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রভুর খুব প্রিয় —শচীমাতা তাঁকে ছেলের মতো স্নেহ করেন।

পথে নিমাই পণ্ডিত গদাধরকে দেখে তাঁর হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, গদাধর! তুমি ন্যায়শাস্ত্র পড়ছ, আমার সঙ্গে কিছু তর্ক বিচার কর।

—জিজ্ঞাসা করুন।

—মুক্তির লক্ষণ কি বলো দেখি ?

—দুঃখের আত্যন্তিক নাশকে শাস্ত্রে মুক্তির প্রকাশ বলে।

এই গদাধরই প্রভুর প্রিয় পারিষদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং প্রিয়তম দাস। গদাধরের গৌরনিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। গৌর-গদাধরের প্রণয় কাহিনী বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিবৃত আছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝা না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ-প্রায়॥

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর পিতার সমবয়স্ক।

পথে নিমাই পণ্ডিতকে দেখলেই তিনি পালিয়ে যেতেন।

তাঁর মতো মান্যগণ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকেও তিনি তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করতেন না। মিশ্রতনয়কে শ্রীবাস উদ্ধত শিরোমণি বলে বিলক্ষণ জানতেন। জগন্নাথের ছেলে এতবড় বিদ্যাবীর হয়েও কৃষ্ণভক্ত নন, এজন্য শ্রীবাসের মনে বড় দুঃখ ছিল। একদিন অধ্যাপকের বেশে নদীয়ার রাজপথ দিয়ে চলেছেন নিমাই পণ্ডিত। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বয়স্য পড়ুয়া। পরিধানে সামান্য একখানি রক্তপ্রান্ত বাস। গলায় চাদর। ললাটে ঊর্ধ্ব তিলকরেখা, হাতে পুঁথি। আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল দোলাতে দোলাতে চঞ্চল চূড়ামণি নিমাই পণ্ডিত চলেছেন নদীয়ার পথে। হাসিভরা মুখ। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে পথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। প্রভু তাঁকে নমস্কার করলেন। 'চিরজীবী হও' বলে শ্রীবাস তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

আজ কোন তর্ক নয়। কোন ফাঁকি জিজ্ঞাসা করা নয়। এই দেখে শ্রীবাস পণ্ডিতের মনে খুব আনন্দ হলো। বন্ধু-পুত্রকে হাসতে হাসতে বললেন :

—কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্যে গোঙাও।
রাত্রি দিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে লোকে কেনে? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥[১]

এই উপদেশ শুনে মহাপ্রভু প্রাণভরে হাসলেন। হেসে খুব নম্রভাবে উত্তর দিলেন, আপনার কৃপা থাকলে কৃষ্ণভক্তি নিশ্চয়ই লাভ হবে। শ্রীবাস পণ্ডিত খুশি হলেন এই কথা শুনে।

দিন যায়।

নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। নানা দেশের ছাত্র এসে তাঁর টোলে ভিড় করে। ছাত্র আর ধরে না।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

মুকুন্দ সঞ্জয়ের প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী এখন নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দিরে পরিণত হয়েছে। তিনি এখন অধ্যাপক শিরোমণি। তাঁর বয়স এখন আঠারো বছর। নবীন যৌবন। দিব্যতেজে সর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময়। সুমধুরভাষী আর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসলীলা প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :

এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দিকে বেঢ়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয়॥
প্রভু বোলে 'তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥'[১]

॥ পাঁচ ॥

তরুণ নিমাই এখন যুবক।

চপলতা, চাঞ্চল্য অনেক কমেছে।

বৃথা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে তিনি এখন আর মত্ত থাকেন না।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীকে দেখলেন। মনে হলো যেন যুগান্তরের চেনা। লক্ষ্মীও চাইলেন যুবকের দিকে। চারি চক্ষের মিলনে দুটি হৃদয়ে জাগে আনন্দের স্পর্শ। তারপর বনমালী বিপ্রের ঘটকালির ফলে এক শুভদিনে লক্ষ্মী এলেন নিমাই পণ্ডিতের জীবনে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে। বিয়ের কিছুদিন পরে নবপরিণীতা

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

বধূর হাতে গৃহ ও মাতৃসেবার ভার অর্পণ করে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর এলেন পূর্ববঙ্গে।

পাণ্ডব-বর্জিত দেশ পূর্ববঙ্গ ধন্য হয়। পদ্মার তরঙ্গে তরঙ্গে জাগে আলোড়ন পরমপুরুষের পদধূলি বক্ষে ধারণ করে। ছাত্ররা আসে দলে দলে নবদ্বীপের এই খ্যাতিমান পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে। অল্পদিনেই অনেক ছাত্র পাণ্ডিত্য ও উপাধিলাভ করে কৃত-কৃতার্থ হলেন। পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের সীমা রইল না। শুধু বিদ্যা নয়, ভক্তিরসও পূর্ববঙ্গেই প্রথম প্রবাহিত করে গেলেন গৌরহরি। তখনো নবদ্বীপ তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রভু নবদ্বীপে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। একদিন তপন মিশ্র নামে একা ভক্ত ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণ সর্বদাই ভক্তির সঙ্গে ইষ্টনাম জপ করতেন, কিন্তু মন ভরত না। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে জানবেন এমন লোক নেই। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্রাহ্মণ এসে তপন মিশ্রকে বলছেন, নিমাই পণ্ডিতের কাছে যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে—তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র নন, সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ। প্রভুর নবদ্বীপ যাত্রার ঠিক আগের দিন মিশ্র এসে দেখেন এই সেই নিমাই পণ্ডিত, স্বপ্নে-দেখা নর-নারায়ণ। নিবেদন করেন তাঁর মনের অভিলাষ, অন্তরের আর্তি।

—সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানবার প্রবল ইচ্ছা, প্রভু।

—ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণভজনের জন্য তোমার মন উন্মুখ হয়েছে। এমন ভাগ্য কয়জনের হয়? তুমি যুগধর্ম পালন কর। কলিযুগে নাম-যজ্ঞই সার। দিনরাত সকল অবস্থায় নাম গ্রহণ কর। এই নামই তোমার চিত্তে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব ও ইষ্টস্ফূর্তি করাবেন।

নবদ্বীপের বিদ্যা-দীপ্ত উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত পূর্ববাংলা ভ্রমণে এসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভূমিকার এক খণ্ডাংশ প্রকাশ করে গেলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের এই মহামন্ত্র লাভ করে মিশ্র আনন্দ-সাগরে মগ্ন হলেন। প্রভুর নবদ্বীপ যাত্রার সঙ্গী হতে চাইলেন তপন মিশ্র। তিনি তাকে কাশী যেতে বলেছিলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, সেইখানে যথাসময়ে আবার দেখা হবে।

রাশি রাশি উপহার নিয়ে প্রভু ফিরলেন নবদ্বীপে।

মাকে প্রণাম করে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন নিমাই।

কিন্তু কৈ, মা তো পুত্রকে স্নেহ-আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করলেন না। ব্যাপার কি? মায়ের চোখে জল কেন? মায়ের হাত দুটি ধরে জিজ্ঞাসা করেন, মা, তোমার মুখ মলিন কেন?

—লক্ষ্মী আর নেই, বাবা।

নিমাইয়ের উজ্জ্বল মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে যায়। চোখে আসে অশ্রু—মৌন ব্যথায় কিছুদিন অতিবাহিত হয়। আবার বিদ্যারসে মগ্ন হলেন বিশ্বম্ভর আগের মতো। শূন্য সংসারে বৃদ্ধা জননীর দিন কাটে নিঃশব্দ হাহাকারের মধ্যে। প্রতিবেশিনীরা এসে পরামর্শ দিলেন নিমাইয়ের বিয়ে দেবার জন্য। ছেলেও মায়ের ব্যথা বুঝলেন। স্বামী নেই, আট-আটটা মেয়ে গেছে, বিশ্বরূপ নেই—সত্যিই তো শূন্য সংসারে মায়ের কত কষ্ট। অবশেষে বিয়েতে মত দিলেন বিশ্বম্ভর।

এবার ঘরেতে এলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের রূপবতী গুণবতী কন্যা।

দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রভু একেবারে পরিপূর্ণ গৃহস্থ সাজলেন। স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী গৃহিণী আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী পরিবৃত হয়ে মনের সুখে তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপের তুলনা নেই—তাঁর সৌন্দর্যের অবধি নেই। রূপে যেমন অনুপমা, গুণেও তেমনি নিরুপমা। এখন তাঁর মনে ভাল করে সংসার করার পূর্বসাধ জেগে উঠল। আগে তিনি সংসার করবেন বলে ধন উপার্জন করতে বিদেশে গিয়েছিলেন। এখন তিনি ঘরে বসেই প্রচুর উপার্জন করতে লাগলেন।

নদীয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি। গৃহে কোন কিছুরই অভাব

নেই। অসংখ্য ছাত্র তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়ে। শচীমাতার গৃহ যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তাঁর বড আদরের নিমাই সংসার-ধর্মে মন দিয়েছে। এখন আর তাঁর কোন দুঃখই নেই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার শোক ভুলেছেন। বিশ বছরের যুবক নিমাই পণ্ডিত শুধু সংসারধর্ম পালন করতেন না, সেইসঙ্গে সদ্ধর্ম রক্ষণ ও সদাচার পালন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছিল। ধর্মশিক্ষার জন্যই তাঁর নদীয়ায অবতার গ্রহণ, স্বধর্ম শিক্ষাদানই তাঁর গার্হস্থ্য লীলার মূল উদ্দেশ্য।

ধর্ম সনাতন প্রভু স্থাপেন সর্বধর্ম।
লোকশিক্ষা লাগি কভু না লঙ্ঘেন কর্ম।
হেন লজ্জা তাঁহারে দেহেন সেই ক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥[১]

ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি এই রকমই কঠোর ছিলেন। কারো সাধ্য ছিল না সন্ধ্যাবন্দনা ও তিলক সেবা প্রভৃতি নিত্য কর্ম না করে প্রভুর সামনে আসেন। এমনি চিরদিন সদাচার-প্রিয় ছিলেন তিনি—ছিলেন ধর্মের মর্যাদা-রক্ষক।

যখন নিমাই পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ভারতের সমগ্র বিদ্বদ্‌সমাজ বিমোহিত, তাঁর বিদ্যাগৌরব ও যশঃসৌরভ যখন সকল দেশে ব্যাপ্ত, সেই সময়ে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি নাকি সর্বশাস্ত্রবিশারদ, সরস্বতীর বরপুত্র। লোকসমাজে ইনি কেশব কাশ্মীরী বলে পরিচিত। ভারতের বিদ্যা-পীঠগুলি পর্যটন করে, সর্বশেষে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানকার বিদগ্ধ-সমাজ তাঁর সর্বশেষ বিদ্যাগৌরব পরীক্ষার স্থল। যদি এখানকার পণ্ডিতদের জয় করতে পারেন তবেই সার্থক হবে তাঁর দিগ্বিজয়ী নাম। নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী শঙ্কিত হলেন।

নিমাই পণ্ডিতের কানে এ-কথা পৌঁছল। তাঁর ছাত্ররা তাঁকে নবদ্বীপের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন সন্ধ্যায়

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তিনি শিষ্য ও ছাত্রদের নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন। পূর্ণিমার রাত। জোৎস্নাভরা আকাশে হীরের টুকরোর মতো শোভা পাচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি। সম্মুখে চন্দ্রকিরণ-বিধৌত প্রসারিত বিচি-বিক্ষিপ্ত গঙ্গা। এমন সময়ে সেইখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন নিমাই। তাঁর রূপের জ্যোতিতে কেশব কাশ্মীরীর চোখে ধাঁধা লাগল। কাছে এসে বসেন। বিনয়নম্র বচনে নিমাই বলেন দিগ্বিজয়ীকে :

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন।[1]

তৎক্ষণাৎ পাণ্ডিত্য অভিমানী সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুখে-মুখে একশো শ্লোক রচনা করে গর্বের সঙ্গে কীর্তন করেন গঙ্গার মহিমা। ঝড়ের বেগে বলে যান শ্লোকমালা। সেই কবিত্ব শক্তি দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়, স্তম্ভিতভাবে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তখন দর্পহারী গৌরভগবান পণ্ডিতকে বহু সম্মান করে হেসে বলেন :

তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি ॥
তুমি ভাল জান অর্থ কিম্বা সরস্বতী ॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোকে তবে পাইবেক সুখে ॥[2]

—কোন্ শ্লোকের অর্থ শুনতে চাও, বলো ?

তখন নিমাই একটি শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করলেন। দিগ্বিজয়ী অবাক। ঝড়ের বেগে আমি গঙ্গাস্তোত্র বলে গেলাম। তার থেকে তুমি এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করলে কি করে ?

—তুমি দেবতার বরে যেমন কবিবর, তেমনি সেই দেবতার বরেই আমি শ্রুতিধর। তোমার শ্লোকে পাঁচ রকম দোষ আছে।

তারপর [redacted]ণভাবে দোষগুলির বিচার করলেন যা শুনে সেই দিগ্বিজয়ীর [redacted]র্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরাজিত হয়ে,

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।
২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নত মস্তকে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন কিন্তু উদারচেতা নিমাই তাঁকে জয়পত্র লিখে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

দিন যায়। মনের সুখে গার্হস্থ্য জীবনযাপন করেন গৌরভগবান। কিছুকাল বাদে গয়াধাম দর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগলো তাঁর মনে। নিছক তীর্থদর্শন নয়, পিতৃকার্য করতেই তিনি গয়াধাম যাবেন। প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে এটি একটি করণীয় কাজ। আশ্বিন মাসের পিতৃপক্ষে তিনি যাবেন স্থির করলেন। মাকে জানালেন এ-কথা। জগন্নাথ মিশ্র লোকান্তর গমন করেছেন অনেক দিন, কিন্তু আজো পর্যন্ত গয়ায় তাঁর পারলৌকিক কাজ করা হয় নি। তারপর একদিন মায়ের চরণবন্দনা করে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে, কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গয়াধামে যাত্রা করলেন শচীনন্দন।

জননীর আজ্ঞা লই মহা হর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে ॥[১]

পদব্রজে বহু নগর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে নদীযার অবতার গৌরসুন্দর চলেছেন তীর্থযাত্রায়। যে দেশে, যে নগরে ও যে গ্রামে পড়ল তাঁর শ্রীচরণের ধূলি, সেই দেশ, সেই গ্রাম পবিত্র হলো, উদ্ধার হলো সেই দেশের মানুষ। পথিমধ্যে প্রবল জ্বর হলো—ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জ্বরের বিরাম হলো। যতই তিনি পুণ্যতীর্থ গযাধামের নিকটবর্তী হন ততই মহাপ্রভুর মনে জাগে দিব্যজ্ঞান। প্রেমোন্মত্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হন। অবশেষে তীর্থস্থানে উপনীত হযে তাঁর আনন্দের অবধি রইল না।

আশ্বিন মাস। পিতৃপক্ষ। গয়াধাম লোকে লোকারণ্য।

সেই অগণিত জনসঙ্ঘের মধ্যে গৌরহরির দীর্ঘাকৃতি ভুবনমোহন সুন্দর মূর্তিখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গয়ার সকল তীর্থে পিণ্ডদান প্রভৃতি সমাধা করে এলেন তিনি বিষ্ণুম[illegible]যখানে রয়েছে বিষ্ণুপদচিহ্ন। মন্দিরের দরজায় প্রভু সাষ্টা[illegible]পদ্মের উদ্দেশে প্রণাম করলেন; সেখানকার ধুলায় দিলেন গড়াগড়ি। তারপর

১ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

মন্দিরের ভেতরে দাঁড়িয়ে পাণ্ডাদের মুখে বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা শুনে তিনি প্রেমাবিষ্ট হলেন। আবিষ্টভাবেই দর্শন করলেন বিষ্ণুপাদপদ্ম। দর্শন করেন আর দুটি কমল নয়ন দিযে অবিশ্রান্ত বারিপ্রবাহের মতো পড়তে থাকে প্রেমাশ্রুধারা।

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥
সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥[1]

এই পুণ্যধাম থেকেই আরম্ভ হয়েছিল প্রভুর প্রেমভক্তিযোগ প্রকাশ।

ঠিক সেই সময়ে গয়াধামে এসেছেন ঈশ্বরপুরী। ইনি অদ্বৈত আচার্যের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। তার এই আগমন দৈবক্রমে নয়, প্রভুরই ইচ্ছায় ঘটেছিল—তিনিই তাঁকে এখানে আকর্ষণ করে এনেছিলেন। গয়াধামে প্রভু ও পুরী গোস্বামীর এই শুভ মিলন ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল। ঈশ্বরপুরী নিমেষহীন চক্ষে চেয়ে রইলেন নিমাইয়ের দিকে। অন্যদিকে অশ্রুসিক্ত পদ্মনয়ন দুটি উপরে মেলে নিমাইও দেখলেন ঈশ্বরপুরীকে। লুণ্ঠিত হলেন তাঁর পদতলে। পুরী গোঁসাই নিমাইকে দিলেন গাঢ় প্রেমালিঙ্গন।

—আপনি আমাকে কৃপা করে দীক্ষা দান করুন।

—তাই হবে। আমি তোমাকে দশাক্ষরী মন্ত্র দেব।

শুভদিনে নিমাই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করলেন। ঈশ্বরপুরীকে প্রদক্ষিণ করে তিনি বলেন: আশীর্বাদ করুন, আমি যেন নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসি।

গয়াধামে পিতৃকৃত্য করে, পৌষ মাসের শেষে প্রভু ফিরলেন নবদ্বীপে। চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি তাঁর সঙ্গীগণ নিশ্চিন্ত হলেন তাঁকে শচীমাতার হাতে সমর্পণ করে। নেপথ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়টিও

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ভরে উঠলো। নিমাই গয়া থেকে ফিরেছেন—এই শুভ সংবাদে নদীয়ার ঘরে ঘরে উঠলো আনন্দধ্বনি। আম্রশাখাসহ মাঙ্গলিক ঘট স্থাপিত হয় প্রতি গৃহদ্বারে। সুশোভিত হয় গৃহতোরণ পত্রপুষ্পে। কারণ নিমাই যে সকলের বুকভরা ধন। তিনি নদীয়ার আনন্দস্বরূপ।

গৃহে উপনীত হয়ে জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দুই হাতে তাঁর পায়ের ধুলো গ্রহণ করেন নিমাই। শচীমাতার দুই চোখ দিয়ে ঝরে প্রেমাশ্রুধারা। তিনি দেখলেন—ছেলে নয়, গয়া থেকে ফিরে এসেছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ এক বৈরাগী। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না তিনি। জয়ানন্দের লেখনীতে মাতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে এইভাবে :

চৌদিকে আনন্দময় হইল নবদ্বীপে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে রৈল মায়ের সমীপে॥
শচীঠাকুরাণী পুত্রে করিল নির্মঞ্ছনা।
কুল বধূ পদাম্বুজ করিল বন্দনা॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল গৌরাঙ্গ কপালে।
আলিঙ্গন দিয়া শচী বসাইল কোলে॥[১]

অধ্যাপক ফিরে এসেছেন।

নিমাই পণ্ডিতের টোল আবার শুরু হয়।

ছাত্ররা অধীর আনন্দে 'হরি' বলে পুঁথির ডোর খোলে।

তারা সবিস্ময়ে দেখে পণ্ডিতের অধ্যাপনার রীতি বদলে গেছে। পুঁথির পাতায় পাতায় ধাতুরূপ, শব্দরূপ, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের পরিবর্তন ঘটে গেল অনেক। এখন পণ্ডিতের ব্যাখ্যার ধারা অন্যরকম। ছাত্রদের কেবল বলেন : শব্দ—হরিনাম ; মূল—কৃষ্ণভক্তি। অশ্রুজলের ভেতর দিয়ে এইরকম ব্যাখ্যাই করতে থাকেন নিমাই পণ্ডিত। ছাত্ররা বসে থাকে নিরুত্তর হয়ে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এইরকম অধ্যাপনা। গঙ্গাদাস পণ্ডিত যখন সব কথা জানতে পারলেন তখন তিনি একদিন তাঁর প্রাক্তন ছাত্রটিকে ডেকে অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন, ঠিকমত অধ্যাপনা করতে।

---

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

সকাল হয়েছে। ছাত্ররা পুঁথি নিয়ে নিমাই পণ্ডিতের টোলে এসেছে। বাড়ির বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে তারা পুঁথি খুলে পড়তে থাকে। প্রভু গঙ্গা স্নান করে এসে ছাত্রদের পড়াতে বসলেন। কিন্তু কৃষ্ণকথা ভিন্ন তাঁর মুখে অন্য কথা আসছে না। প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

প্রভুর স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত আন।
শব্দ মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥

.. ..

এইমত পবিত্র পুণ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণ ভাই সব'কর দৃঢ়ভক্তি ॥
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
অহর্নিশে কৃষ্ণের চরণ করহ ধ্যান ॥[১]

কিন্তু এইভাবে তো অধ্যাপনা চলতে পারে না। একদিন নিমাই যখন তাঁর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন কি পাঠ শিখলে তোমরা?

—গয়া থেকে আসার পর নতুন পাঠ কিছুই দেন নি। শুধু কৃষ্ণনামই করেছেন, অন্য পাঠ আমরা পাইনি।

—তোমাদের অনুমতি দিলাম, তোমরা অন্য কোনো অধ্যাপকের কাছে গিয়ে পাঠ গ্রহণ করে বিদ্যালাভ কর।

নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের টোলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

বিদ্যাবিলাস ঐশ্বর্যলীলা আর নয়।

আর নয় বিদ্যারসে উন্মত্ততা।

নিমাইপণ্ডিতের সমগ্র সত্তা এখন কৃষ্ণরসে অভিসিঞ্চিত।

সেই যে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন—'বিদ্যার

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?' রামানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।'—সেই কৃষ্ণভক্তি এবার তিনি প্রকাশ করবেন। তাঁর নবদ্বীপ-লীলার মধুরতম অধ্যায় এইটি।

একদিন।। রাত্রি তখন চারদণ্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

নিমাই চলেছেন রত্নগর্ভ আচার্য পণ্ডিতের বাড়ি। তাঁর পিতৃবন্ধু ছিলেন ইনি। পরম ভাগবত তিনি। তাঁর গৃহে উপস্থিত হওয়া মাত্র বিপ্রবর বন্ধুপুত্রকে দেখে ভাগবতের একটি ভক্তি-উদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁকে শোনালেন :

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য বর্হ-
ধাতু প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেন ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলাল কপোল মুখাব্জহাসং॥

নিমাইয়ের কানে এই শ্লোক প্রবেশ করামাত্র তাঁর শ্রীঅঙ্গে আট প্রকার সাত্ত্বিকভাবের উদয় হলো। তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সঙ্গীরা তাঁর এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়। এর কারণ কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। সবাই তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় রত হয়। কতক্ষণ বাদে মূর্ছার ঘোর কাটল। বাহ্যজ্ঞান পেয়ে তিনি কেবল বলেন 'বলো বলো' আর প্রেমাবেশে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। অঝোরনয়নে কাঁদেন বালকের মতো।

রত্নগর্ভ আচার্য পণ্ডিত বুঝলেন, বন্ধুপুত্রের হৃদয়ে উথলে উঠেছে কৃষ্ণ-বিরহ-সমুদ্র। প্রভু যত বলেন 'বলো বলো', তিনি ততই উৎসাহের সঙ্গে বারবার শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। শুনতে শুনতে আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে প্রভু তাঁর পিতৃবন্ধুকে বারম্বার আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের সমস্ত অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। অমনি প্রেমপুলকিত অঙ্গে, তিনি প্রভুর চরণতলে নিপতিত হন। গৌরহরির অজভববন্দিত রাতুল চরণ দুটি নিজের বুকে ধরে বিপ্রের সে কি অঝোর ক্রন্দন।

দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হইয়া প্রভু তার দিল আলিঙ্গন॥

পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গনে।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেই ক্ষণে॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেম ফাঁদে॥[১]

গয়া থেকে ফিরবার পর ছেলের ভাবান্তর যেমন লক্ষ্য করেছেন শচীদেবী, তেমনি স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। একদিন ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শেষ করে মহাপ্রভু গৃহে ফিরলেন। রাত তখন দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রান্নাবান্না করে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ দুজনে উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিমাইয়ের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। দুজনে বসে সাংসারিক কথা হচ্ছে। উভয়েই বিষণ্ণ। কারো মনে সুখ নেই। কিন্তু কেউ কাউকেও মনের দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন না।

ছেলের সংসার বৈরাগ্যের কথা বললে বালিকা পুত্রবধূ মনে ব্যথা পাবেন—চিন্তা করছেন শচীদেবী। শাশুড়ীর কাছে তাঁর প্রাণবল্লভের কথা আর কি বলবেন? চিন্তা করছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর মনের কথা মনের মধ্যেই রাখেন। শাশুড়ী-বৌতে সাংসারিক কথা হচ্ছে, এমন সময়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত নিমাই বাড়ি ফিরলেন। শচীমাতা উঠে এসে ছেলের হাত ধরে আদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া চলে গেলেন রান্নাঘরে। মিশ্র ভবনের পুরাতন ভৃত্য ঈশান নিমুর পা ধুয়ে দিলো। কিছুক্ষণ বাদে নৈশ আহার সমাধা করে প্রভু চলে গেলেন শয়নকক্ষে।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রসাদ পেয়ে শোবার ঘরে এসে দেখেন, স্বামী নিদ্রিত। পায়ের তলায় বসে নিঃশব্দে পদসেবা করতে থাকেন। ঘুমের মধ্যে একবার 'হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলে চমকে উঠে পাশ ফিরলেন গৌরহরি। স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে মনে করে, বিষ্ণুপ্রিয়া তখন বিছানা থেকে উঠে মাটিতে আঁচল পেতে শুলেন।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তাঁর চিন্তার কূলকিনারা নেই। সারাটা রাত তিনি ভূমিশয্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। এমনি রজনী বিয়ের পর থেকেই তিনি যাপন করে এসেছেন। এ আজ নতুন কিছু নয়। স্বামী গয়া থেকে ফিরলেন, সকলের সঙ্গে কথা বললেন, বলেন নি শুধু তাঁর সঙ্গে। কিন্তু এজন্য কোন অনুযোগ করেন নি স্বামীর কাছে।

এইবার নিমাই-জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

আরম্ভ হয় সংকীর্তন-যজ্ঞ। সংকীর্তন-যজ্ঞেশ্বর নবদ্বীপচন্দ্র নিজে আচরণ করে কলির জীবকে শিক্ষা দিলেন যুগধর্ম। কি সেই যুগধর্ম? সংকীর্তন-যজ্ঞ। নবদ্বীপে এই প্রথম তিনি কৃষ্ণকীর্তন প্রকাশ করলেন। হাতে তালি দিয়ে ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ সংকীর্তনের প্রথম সুর ধরলেন :

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

অমনি চারদিকে উঠলো আনন্দধ্বনি। মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি করলেন নবদ্বীপের পুরনারীবৃন্দ। প্রতি গৃহে বেজে উঠলো শুভ শঙ্খ। তাঁর মধুকণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই যোগ দিল নাম সংকীর্তনে। নদীয়ায় এই প্রথম আরম্ভ হয় সংকীর্তন। আরম্ভ হয় গৌরভগবানের আত্মপ্রকাশ।

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হলো বিনাশ ॥[১]

কলিযুগে হরিসংকীর্তনেই সকল রকম ধর্মাচরণের ফল পাওয়া যায়, লাভ হয় সর্বসিদ্ধি। এ শাস্ত্রবাক্য।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥[২]

কলির জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দেবার এই প্রথম উদ্যোগ আরম্ভ

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

২ বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

হলো পৃথিবীতে। সংকীর্তনের ভেতর দিয়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, সংকীর্তনের ভেতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ। এই লীলা সাধারণ জীবের বুদ্ধির অগম্য। গয়া থেকে তিনি ফিরেছেন পৌষ মাসে আর মাঘের প্রথম দিন থেকেই যুগধর্ম প্রচারের জন্য নদীয়ায় শুরু হয় সংকীর্তন-যজ্ঞ। তখন থেকেই নবদ্বীপে এক এক আসতে থাকেন অদ্বৈত আচার্য হরিদাস নিত্যানন্দ প্রভু এবং মহাপ্রভুর অন্যান্য নিত্য পরিকরবৃন্দ। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি হলো সংকীর্তনের প্রধান শিবির। আবার জমজমাট হয়ে ওঠে অদ্বৈত সভা। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করবার জন্য অনেক দিন আগে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার প্রাণ ছিলেন প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ। তার গৃহত্যাগের পর থেকে এই সভা নামে মাত্র সভা ছিল। এখন সেই সভায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো।

গৌরলীলায় অদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের ভূমিকাটি একটু আলোচনা করতে হয়। এরা দুজনেই তার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ ছিলেন। একজনকে বলা হয় গৌর আনা গোঁসাই। অন্যজন ছিলেন নামের মহিমার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। স্বরূপ গোস্বামী তার কড়চায় দুটি শ্লোকে অদ্বৈতপ্রভুর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়ায় যঃ সৃজত্যদ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বর ॥
অদ্বৈত হরিণাদ্বৈতাদাচার্য ভক্তি শংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥

অর্থাৎ মায়াদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যে জগৎকর্তা মহাবিষ্ণু, অদ্বৈত আচার্য তারই অবতার। তিনি হরি—শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে অভেদ—তাই তার নাম অদ্বৈত। তিনি ভক্তি উপদেশ প্রদান করেন বলে আচার্য। তিনি ভক্তরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তাঁর চরণাশ্রয় ভিন্ন মহাপ্রভুর কৃপালাভ অসম্ভব। অদ্বৈততত্ত্বের বিশদ বিবরণ আছে কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে বাস করছিলেন। আবির্ভাবের সংবাদ শুনে প্রেমানন্দে হুঙ্কার করে তিনি কৃষ্ণকীর্তন করেছিলেন। নবজাত নিমাইচাঁদকে দেখবার জন্য সীতাদেবী নবদ্বীপে এসেছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত আসেন নি। অভিমান ভরে বলেছিলেন, আমার প্রভু এখানে এসে আমাকে দর্শন দিয়ে যাবেন। অদ্বৈত আচার্য ভক্তির অবতার। ভক্তের ভগবানই ভক্তের মান-অভিমানের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। শান্তিপুরনাথের জীবনে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। অদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্রের অভিমানী মর্মী ভক্ত। তাঁর অভিমানমিশ্রিত দাস্যভাবে গৌরহরি মুগ্ধ।

গৌরলীলার একটি উন্নত স্তম্ভ হরিদাস ঠাকুর।

তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে থাকতেন। শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়া পাহাড়ের গহ্বরে বসে তিনি ভজন করতেন। দিনরাত উচ্চ নামসংকীর্তন তার ভজনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ না করে জলস্পর্শ করতেন না। তার কাজ ছিল নামমাহাত্ম্য প্রচার করা। এই নাম প্রচার কাজে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে বলা হয় ব্রহ্মার অবতার। তাই মহাজনগণ তাকে ব্রহ্ম হরিদাস আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করলে গৌরনামে রুচি হয়, দূর হয় সকল পাপ।

ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন ঠাকুর হরিদাস।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যবন গৃহে লালিত পালিত হওয়ার জন্য, লোকে তাকে যবন হরিদাস বলে জানত। অনেকে যবন হরিদাস বলে তাকে ডাকতো। যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের জন্ম হয়। পিতামাতা দুজনেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তাঁর বয়স যখন মাত্র দু'মাস, তখন তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতিবেশী এই অনাথ বালককে প্রতিপালন করেন।

যবনপালিত এই শিশু অতি শিশুকাল থেকেই হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ সাধু ভক্ত

বলে গণ্য হলেন। লোকে জানত হরিদাস যবনের ছেলে। মুসলমান হয়ে তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন, হিন্দু আচারে হিন্দুর দেবতা পূজা করছেন, হরিনাম কীর্তন করছেন। যবনরাজের কানে গেল এই কথা। তিনি হরিদাসকে ধরে আনতে আদেশ দিলেন। কাজির আদেশে তাঁকে রাজদরবারে আনা হলো। ভালো কথায় যবনরাজ তাঁকে স্বধর্মে আনবার চেষ্টা করেন। কিছুতেই তিনি তা পারলেন না। তখন কাজির বিচারে তাঁর প্রতি বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের দণ্ড দেওয়া হয়। নৃশংস সেই বিচার হাসি মুখে গ্রহণ করেন হরিদাস ঠাকুর।

কাজি বোলে বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে॥[১]

এই দণ্ডাজ্ঞা শুনে হরিদাস নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন :

খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥[২]

তাঁর পিঠে যত বেত পড়ে, হরিদাস কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করে, মুখে অবিরাম হরিনাম করেন আর বলেন, প্রভু, এরা আমার ওপর অত্যাচার করছে, কিন্তু তুমি এদের অপরাধ নিও না। বেত্রাঘাতেও যখন তাঁর প্রাণ গেল না, তখন প্রহরীদের মনে ভয় হলো যে, কাজী তাদের প্রাণবধ করবেন। তারা তখন বিনয়বচনে তাঁকে বলে :

ওহে হরিদাস।
তোমা হইতে আমা সভার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥[৩]

তখন হরিদাস বলেন, আমি বাঁচলে যদি তোমাদের মন্দ হয়, তবে দেখ তোমাদের সামনেই আমি মরছি। এই বলে তিনি ধ্যানে ডুবে

১, ২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৩ তদেব।

গেলেন। নিস্পন্দ হয়ে যায় তাঁর সমস্ত শরীর। তখন তাঁর দেহ গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়া হয়। গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া নগরে এসে উপস্থিত হলেন। জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি। হরিদাস কীর্তন করতে করতে তীরে উঠলেন।

এই হরিদাসকে দিয়ে মহাপ্রভু নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়েছিলেন। নামের মহিমা কতখানি তিনি নিজে আচরণ করে তা কলির জীবকে দেখিয়ে গেছেন। গৌরলীলায় নাম মাহাত্ম্য কীর্তনে ইনিই প্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। তারপর তিনি এলেন শান্তিপুরে। মিলিত হলেন অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে। সেখানে গঙ্গাতীরে একটি নির্জন কুটীরে তিনি উচ্চ নামসংকীর্তন যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরিকে আহ্বান করতে থাকেন। এদিকে গঙ্গাজল ও তুলসী নিয়ে অদ্বৈত সেই গঙ্গাতীরে বসে সেই একই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে আহ্বান করে চলেছেন। দুজনে একত্র হলে সেই একই প্রসঙ্গ, একই প্রতিজ্ঞা। আচার্যের বাড়িতে হরিদাস নিত্য প্রসাদ পেতেন। ভগবানের অবতরণের জন্য এই দুই ভক্তের প্রতিজ্ঞা মিলেছিল। যে হরিদাসকে লোকে যবন বলতো, বলতো তার নীচকুলে জন্ম, সেই হরিদাসকেই একদিন অদ্বৈত আচার্য সকলের সামনে শ্রাদ্ধপাত্র এনে ভোজন করতে দিয়েছিলেন। শান্তিপুরনাথের এই আচরণই তো হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্যকে সর্বকালের জন্য ভাস্বর করে রেখেছে। অধম কুলেতে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ কৃষ্ণভক্ত হয়, সে মানুষ সর্বজনপূজ্য—শাস্ত্রের এই সত্যটাই হরিদাস জীবনে প্রমাণিত হয়েছে।

॥ সাত ॥

দিন যায়।

নিমাইয়ের মতি-গতি ভাবিয়ে তোলে শচীমাতাকে, ভাবিয়ে তোলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। এখন তিনি সব সময় 'হা কৃষ্ণ' বলে

কাঁদেন, মাটিতে গড়াগড়ি দেন। লোকে এসে শচীমাতাকে বলে, তোমার ছেলের বায়ুরোগ হয়েছে। তিনি এই কথা জানালেন তাঁর স্বামীর বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতকে। তিনি এলেন একদিন মিশ্রভবনে বন্ধুপুত্রকে দেখতে। নিমাই তখন তুলসীতলায় প্রদক্ষিণ করছিলেন। নমস্কার করেন সসম্ভ্রমে শ্রীবাসকে। কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসকে দেখা মাত্র তাঁর মনে উথলে উঠে ভক্তির প্রবাহ—আট প্রকার সাত্ত্বিকভাব ফুটে ওঠে তাঁর শরীরে। প্রেমানন্দে তিনি মূর্ছা গেলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত বিস্মিত।

নিমাইয়ের অশ্রু, কম্প, পুলক দেখে তিনি মনে মনে ভাবেন—এ মহা ভক্তিযোগ। বায়ু রোগ নয়। বলেন নিমাইকে

মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে।

শচীমাতাকে বোঝালেন তিনি

চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।
বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে।[২]

নিমাই জননীর চিন্তার উপশম হলো এই কথা শুনে। ছেলের তাহলে কোনো অসুখ করেনি। কিন্তু তাঁর অন্তরের উদ্বেগ দূর হয় না। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে নিমাই গৃহত্যাগ করবে না তো? শুনলেন একথা বিষ্ণুপ্রিয়া—তিনিও বুঝলেন তাঁর স্বামী উন্মাদ নন তাঁর কোনো অসুখ নেই। যে অসুখ আছে তা কৃষ্ণবিরহ। এর তো কোনো ওষুধ নেই। তখন থেকেই তিনি তার স্বামীর চরণে—গৌর ভগবানের চরণে—আত্মনিবেদন করতে শিখলেন নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে।

অদ্বৈত আচার্য সব কথা শুনলেন।

মিশ্র ভবনে তব আসেন না তিনি।

তার মনের ভাব খুবই গম্ভীর। সে গম্ভীর চরিত্র বুঝবার শক্তি কারো নেই। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস

২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

যদি সত্য প্রভু হয় মুঞি হব দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥[১]

অদ্বৈতের মনের কথা এই যে, শচীনন্দন সত্যি যদি আমার প্রভু হন, তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন. আমার চুলের মুঠি ধরে তাঁর পায়ে টেনে নেবেন. আমার কাছে এসে আমাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

ভক্তির বল বড় বল।

অদ্বৈতের ভক্তি মহাপ্রভুকে টেনে নিয়ে এলো তাঁর কাছে।

একদিন গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈতকে দর্শন দিতে চললেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। নবদ্বীপের পথে চলেছেন গৌর-গদাধর প্রেমানন্দে টলমল হয়ে। চলেছেন তাঁরা মনোহর বেশে হাত ধরাধরি করে। নদীয়ার পথ আলো করে তাঁরা দুজনে চলেছেন অদ্বৈত সভার দিকে। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম, চোখে প্রেমাশ্রুধারা।

তখন অদ্বৈত তুলসীতলায় বসেছিলেন।

প্রেমানন্দে 'হরি হরি' বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন।

কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন।

কোনো দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর।

অদ্বৈতের অঙ্গনে ঢুকেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। গদাধর তাকে কোলে করে সেখানে বসলেন। সেই অবস্থায় গৌরাঙ্গ দর্শন করে, অদ্বৈত যারপরনাই পুলকিত হলেন। 'এই তো আমার অভীষ্ট দেবতা—এই তো আমার প্রাণের ঠাকুর।' তারপর, একটু সংযত হয়ে, পূজার সমস্ত আয়োজন—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ—নিয়ে বসেন তাঁর পায়ের তলায়। যুগল চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেন এই বলে :

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

তখন ভক্তের পূজায় তুষ্ট হয়ে, গৌর ভগবান বললেন :

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ধন্য হইলাঙ আমি দেখিল তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি যে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বথা প্রকাশ॥[১]

নদীয়ায় আরম্ভ হয় গৌরহরির সংকীর্তনলীলা।

সংকীর্তনের ভেতর দিয়ে তাঁর আবির্ভাব।

সংকীর্তনের ভেতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ।

অপূর্ব সেই কীর্তনলীলারঙ্গ দেখে বিস্মিত হয় নদীয়ার নরনারী। এমন জিনিস তারা আগে কখনো দেখেনি বা কখনো শোনেনি। কীর্তনানন্দে তাঁকে আবিষ্ট দেখে নদীয়ার বৈষ্ণবগণ বলাবলি করেন: এই বুঝি প্রভু অবতার।

দিন যায়।

প্রভুর মুখে এখন শুধু দুটি কথা: 'হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!'

তিনি এখন সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত।

কৃষ্ণবিরহে তাঁর সমস্ত সত্তা এখন ভরপুর।

কৃষ্ণনাম ছাড়া অন্য কথা নেই মুখে। মন তাঁর সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত। ঘরে-বাইরে তাঁর একই ভাব। শচীমাতার বিষম চিন্তা হয় পাছে নিমাই, বিশ্বরূপের মতো, সংসার ছেড়ে চলে যায়। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে এই নিয়ে কত আলোচনা করেন তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটায় মুখ নীচু করে শাশুড়ীর সব কথা শোনেন। মনে তাঁর এতটুকু সুখ নেই। স্বামী বিনিদ্র রজনী যাপন করেন অন্তঃপুরে শয়নগৃহে।

একদিন গদাধরকে জিজ্ঞাসা করেন নিমাই—কৃষ্ণ কোথায়?

—কৃষ্ণ তো সর্বদা তোমার হৃদয়ে।

কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন, এই শুনে তাঁকে খুঁজতে সচেষ্ট হন।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

প্রেমাবেগে উন্মত্ত হয়ে নিজের সুন্দর বুকে নখাঘাত করতে উদ্যত হন। অমনি হাত ধরে ফেলেন গদাধর। এইরকম কৃষ্ণানুসন্ধান পুরাণেও দেখা যায় না। তখন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়। ওপরের দিকে মুখ করে উত্তাল নয়নে আবৃত্তি করেন এই শ্লোকটি :

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুনৈক সিন্ধো!
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

মিশ্র ভবনে আজকাল প্রাত সন্ধ্যায় ভক্তদের সমাবেশ হয়। কৃষ্ণ কথা হয়, কৃষ্ণ সংকীর্তন হয়। সে কি উদ্দাম সংকীর্তন। সারা রাত ধরে চলে কীর্তনবিলাস। বৈষ্ণব ভক্তদের আনন্দের অবধি থাকে না, কিন্তু উত্তেজিত হয় পাষণ্ডীদের হৃদয়, কারণ তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা কটকাটব্য বলতে থাকে। তাদের রাগের মাত্রাটা বেশি শ্রীবাস পণ্ডিতের ওপর। শ্রীবাস-অঙ্গনেই কীর্তন জমজমাট।

একদিন। সকালবেলা। সবে সূর্য উঠেছে।

নবদ্বীপের রাজপথে চলেছেন নবদ্বীপচন্দ্র অপরূপ রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত করে। চলেছেন তিনি গঙ্গাতীর অভিমুখে। গঙ্গা-তীরে গঙ্গার শোভা দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মনে জাগে বৃন্দাবনস্মৃতি। অমনি প্রেমানন্দে আবিষ্ট হয়ে গৌরহরি বলে ওঠেন : 'আমি সেই, আমি সেই।' আত্মপ্রকাশের এই বাক্য টুটি শুনেই ভক্তগণ আকৃষ্ট হতেন আর প্রভুর অন্তর বুঝে পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ চন্দন ধূপ দীপ ফুল প্রভৃতি দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করতেন।

গঙ্গাতীরের কাছেই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি।

'আমি সেই, আমি সেই' বলে হুঙ্কার গর্জন করতে করতে গৌর ভগবান ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবাসের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পণ্ডিতের গৃহদেবতা নৃসিংহদেব। তিনি তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে পূজায় বসেছিলেন। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয়। দরজায় সজোরে পদাঘাত করে হুঙ্কার করতে করতে প্রভু বলেন :

কাহারে বা পূজিস্‌ করিস কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস তারে দেখ বিদ্যমান॥[১]

ধ্যান ভেঙে যায় শ্রীবাসের। চারদিকে বিস্ময়ে চাইতে থাকেন। দেখেন ইষ্টদেবের স্থানে বীরাসনে বসে আছেন মিশ্রতনয় বিশ্বম্ভর। চতুর্ভুজ মূর্তি। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। সেই মূর্তি দেখে আর হুঙ্কার শুনে শ্রীবাসের সমস্ত শরীর থরথর কাঁপতে থাকে। তিনি যেন স্থাণুর মতো হয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন জোড়হাতে নির্বাক হয়ে।

এইবার বলি নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আসার কথা।

গৌরাঙ্গপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার অনেক আগে, ১৩৯৫ শকে, রাঢ় দেশে একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ও কুলবতী স্ত্রী পদ্মাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নিত্যানন্দ। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল কুবের। গৌর-নিতাই অভিন্ন কলেবর। মহাপ্রভুর জীবোদ্ধার কাজের তিনিই প্রধান সহায়। নবদ্বীপলীলার প্রধান পুরুষই তিনি। যথা সময়েই তাঁকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করে নিয়ে আসেন মহাপ্রভু। অপূর্ব তাঁর জীবন-কথা।

ছেলের বয়স যখন মাত্র বারো বছর তখন একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে পিতামাতার কাছে ভিক্ষা চাইলেন কুবেরকে। কুবের তাঁদের একমাত্র জীবনসম্বল পুত্ররত্ন। তবু তাঁদের ছেলেকে দান করলেন তাঁরা। বারো বছর বয়সেই তিনি সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। গুরু তাঁর নাম রাখেন নিত্যানন্দ। আনন্দ যার নিত্য সঙ্গী তিনিই নিত্যানন্দ। সেই বারো বছর বয়স থেকে নিতাই তাঁর গুরুর সঙ্গে, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। তারপর নবদ্বীপচন্দ্রের আকর্ষণে নবদ্বীপে চলে আসেন। তীর্থ পর্যটন-কালেও তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়নের বিরাম ছিল না।

অপরূপ রূপ ছিল নিতাইচাঁদের।

মানুষে এত রূপ কেউ কখনো দেখেনি।

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

রূপের সাগর ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু।

চৈতন্য-লীলায় তাঁর স্থানটি সকলের আগে। বৃন্দাবনদাস তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :

চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁর জিহ্বায়॥
অহর্নিশি চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তানে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে॥[১]

ভগবানের যাঁরা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ তাঁরা তাঁর অবতারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শচীনন্দন আর পদ্মা-তনয়—এই দুইজনের নিগূঢ় পরিচয় কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায় ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥[২]

মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুকে বলতেন : 'নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।' তিনি সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের অবতার! কৃষ্ণরস-অবতার। এ সবই তত্ত্বের কথা। সাধারণের জন্য নয়। তাদের জন্য লীলা কথা। সেই কথা এখন বলি।

বিশ বছর ধরে গুরুর সঙ্গে ভারতের সকল তীর্থ পর্যটন করে, নিত্যানন্দ এসেছিলেন বৃন্দাবনে। এইখানেই তাঁর পূর্বলীলা স্মরণ হয়—একে একে মনের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে পূর্বস্মৃতি। ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেছেন গৌরচন্দ্র। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে তিনি অগ্রজ বলরামের বিরহে কাতর। নিত্যানন্দ কি

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আর স্থির থাকতে পারেন। ব্রজধাম ত্যাগ করে ছুটলেন তিনি নবদ্বীপধামে। গৌর-প্রেমে আত্মহারা হয়ে অবধূত বেশে গৌরদর্শনে চলেছেন নিত্যানন্দ। সঙ্গে তাঁর বহু লোক।

অবশেষে নবদ্বীপে পৌঁছলেন তিনি।

গৌর ভগবান তখন আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আরম্ভ করেছেন যুগধর্ম—সংকীর্তন যজ্ঞ।

শ্রীবাস অঙ্গনে তাঁর অভিষেক করেছেন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ।

নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে উঠলেন নিত্যানন্দ। নদীয়ার পথে পথে তিনি নিমাইচাঁদের খোঁজ করতে করতে এসেছেন। নন্দন আচার্য মহাভাগবত। প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। মহাসমাদরে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে স্থান দিলেন নিজ গৃহে। তিনি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন বুঝি দ্বিতীয় গৌরাঙ্গের উদয় হলো। নিত্যানন্দ নন্দন আচার্যকে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গের বড় ভাই। তখন নন্দন আচার্যের মনে বিশ্বরূপের কথা জেগেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, তবু মনে মিলিয়ে দেখলেন, এই অবধূত সন্ন্যাসীতে ও প্রভুর অগ্রজে অনেক বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু তিনি সেসব কথা মনে মনেই রাখলেন।

এদিকে গৌরহরি নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাগমনের সংবাদ পেলেন। একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তদের তিনি বললেন, শীঘ্রই এখানে একজন মহাপুরুষ আসবেন। সবাই আনন্দিত হয় এই কথা শুনে। তখন তিনি হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে এই মহা-পুরুষের খোঁজ করতে বললেন। নিত্যানন্দ রয়েছেন নন্দন আচার্যের বাড়িতে প্রচ্ছন্নভাবে। বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত খোঁজ করেও তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

—প্রভু! সেই মহাপুরুষের তো কোথাও খোঁজ পেলাম না।

এই কথা শুনে মহাপ্রভু একটু হাসলেন।

কিন্তু কেউ তাঁর সেই হাসির মর্ম বুঝতে পারলেন না।

গৌর ভগবান তখন আর দ্বিতীয় কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন।

—এসো তোমরা আমার সঙ্গে।

শ্রীবাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চললেন নন্দন আচার্যের বাড়ির দিকে। তখন অপরাহ্ণ হলেও পথ ঘাট জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রে উত্তপ্ত। ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে চলেছেন তিনি নিত্যানন্দের কাছে। নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে দেখেন:

বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য সম॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন না যায়।
ধ্যানে সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদাই॥[1]

এই তো সেই মহাপুরুষ! নমস্কার করলেন মহাপ্রভু—নমস্কার করলেন শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ। সবাই সসম্ভ্রমে এক্ককরে দাঁড়িয়ে রইলেন নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে। সকলেই পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর সুন্দর জ্যোতির্ময় মুখের দিকে। তখন নিত্যানন্দ কি করলেন? তিনি তাঁর প্রাণের ঈশ্বরকে চিনলেন। কিন্তু মনের আনন্দে ও প্রাণের আবেগে কোনো কথা বলতে পারলেন না। আর ভক্তরা কি করলেন? তারা একবার একজনের মুখের দিকে চাইছেন আর একবার অন্যজনের মুখের দিকে চাইছেন। নবদ্বীপে দুই চাঁদের উদয় দেখে তারা বিস্মিত হলেন। কীর্তন আরম্ভ হয় নন্দন আচার্যের গৃহে। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত চলে সেই সংকীর্তন। নদীয়া নগরী ডুবে যায় কীর্তন তরঙ্গে। আগন্তুক মহাপুরুষের কথা প্রচারিত হয় নদীয়ার ঘরে ঘরে। লোক আসে দলে দলে নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে। গৌর নিতাইয়ের প্রথম শুভ মিলন দেখে কৃতার্থ হয় তারা।

॥ আট ॥

আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন বিলাস
সব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

যত যত স্থানে সব পাষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপে আইলা॥[১]

গৌরভগবান সংকীর্তন-যজ্ঞেশ্বর।

তিনি সংকীর্তন রাস-রসিক।

তাঁর জন্মলগ্নেই যুগধর্ম হরিনাম নদীয়ায় এসে গিয়েছে

সেই সংকীর্তনের বন্যাস্রোত এখন বয়ে চলেছে নদীয়ার দুই তীর দিয়ে প্রভুর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সমস্ত পারিষদগণ—যিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—এখন পুণ্যধাম নবদ্বীপে এসে গৌরহরির সঙ্গে মিলিত হলেন। সবাই জানলো প্রভু নদীয়ায় অবতার গ্রহণ করেছেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে চলে দিবারাত্র কীর্তন।

ভুবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্তনে নদীয়ার আকাশবাতাস পরিপূর্ণ।

যা ছিল এতদিন শ্রীবাস অঙ্গনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই মহা সংকীর্তন এখন নেমে এল নবদ্বীপের রাজপথে। সমস্ত নবদ্বীপ এখন কীর্তনময়, কীর্তনের মধুর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না। সংকীর্তনের জোয়ার বয়ে চলেছে—নদীয়ার নরনারীর অন্তরে বয়ে চলেছে আনন্দের জোয়ার। পাষণ্ডীরা গেল কাজীর কাছে নালিশ করে তিনি কীর্তন নিষেধ করে দিলেন

চাঁদকাজী নবদ্বীপে মুসলমান বাদশাহের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। প্রবল প্রতাপ তার। একদিন সন্ধ্যায় কাজী নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথে বের হওয়া মাত্র তার কানে এলো হরিনামের উচ্চ কোলাহল। নালিশ তাহলে যথার্থ ভাবলেন তিনি। অমনি লোকজন দিয়ে সংকীর্তনের মৃদঙ্গ মন্দিরা সব ভাঙিয়ে দিলেন। কীর্তনকারী বৈষ্ণবদের শাস্তি দিলেন। হুকুম জারি হলো যেন এমন কর্ম আর কেউ না করে। নদীয়া নগরে হুলস্থূল পড়ে গেল। নিমাই পণ্ডিতের উপর কাজীর বড় রাগ, কারণ তিনি শুনেছেন,—এই সংকীর্তনের মূল তিনি। প্রকাশ্য রাস্তায় ভক্তদের কীর্তন বন্ধ হয়ে গেল। ঘরেও করতে সাহস পান না।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

কীর্তনকারীর জাত নাশ করা হবে—কাজী এই আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা এখন মনে মনে হরিনাম জপ করেন।

ভক্তরা এসে মহাপ্রভুর কাছে তাঁদের মনোদুঃখ জানালেন:

কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥[১]

এই কথা শুনে ক্রোধে একেবারে রুদ্রাবতার হলেন তিনি। কাজী কীর্তন মানা করেছেন শুনে ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন: আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছেন, এইবার কাজীকে উদ্ধার করবেন। শুধু উদ্ধার করা নয়—নদীয়া যবন শূন্য করবেন তিনি।

সন্ধ্যাবেলা। মহাপ্রভু বেরুলেন নিজ গৃহ থেকে।
কীর্তন করতে করতে গঙ্গার দিকে চললেন।
এই পথ দিয়ে কাজীর ভবনের দিকে অগ্রসর হলেন।
আজ তিনি নবভাবে মধুর কীর্তন করতে করতে চলেছেন।
পেছনে পেছনে হরিধ্বনি করতে করতে চলেছে লক্ষ লক্ষ লোক।

আগে কীর্তনের দল—কীর্তনের পুরোভাগে অদ্বৈত আচার্য, তারপর হরিদাস ঠাকুর, তারপর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দল। সঙ্গে আছেন গদাধর পণ্ডিত ও নিত্যানন্দ প্রভু। সকলের পেছনে কীর্তন-যজ্ঞেশ্বর গৌরহরি। এত বড়ো সংকীর্তন এর আগে নদীয়ায় কখনো হয় নি। প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে করতে প্রভু চলেছেন কাজীর বাড়ির দিকে। এই বিরাট নগর-কীর্তনের চিত্তস্পন্দী চিত্র এঁকেছেন চৈতন্যভাগবতের কবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনিতে নদীয়া নগরী পরিপূর্ণ হলো।

নদীয়ার রাজা আজ কাজী নন। নদীয়ার রাজা নিমাই পণ্ডিত। কীর্তনের দল ক্রমশ কাজীর বাড়ির কাছাকাছি হতে থাকে। কীর্তনের

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

বাগু কোলাহল তাঁর কানে গেল। এতো গান-বাজনা কিসের? এতো আলো কিসের? আমার আদেশ লঙ্ঘন করে কে হিন্দুয়ানী করে? তাঁর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন কাজী। তারা এসে যে সংবাদ দিল তাতে কাজীর হৃৎকম্প হলো। কীর্তনের কোলাহল ক্রমশ তাঁর বাড়ির কাছাকাছি হয়। প্রভুর কীর্তন-সেনাদল কাজীর গৃহপ্রাঙ্গণ ঘেরাও করলো। তখন সংকীর্তন যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং এসে কাজীর দরজায় দাঁড়ালেন। তিনি যেন যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত। তাঁর কণ্ঠে রণ-হুঙ্কার:

—আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥
নির্যবন করোঁ আজ সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল যবন॥[১]

তারপর চাঁদ কাজীকে ডেকে পাঠালেন গৌরহরি। কাজীর মনে খুব ভয় হয়েছিল। কিন্তু যখন শুনলেন নিমাই পণ্ডিত তাঁকে ডাকছেন, তখন তাঁর মনে সাহস হলো। মাথা নত করে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি প্রভুর সম্মুখে। প্রাণভয়ে কাজী কাঁপছিলেন, কিন্তু প্রভুর সহাস্য বদন দেখে, তাঁর দেহে যেন প্রাণ এলো। তারপর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হলো। যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র কথা শুনে চাঁদ কাজীর মুখে আর কথা নেই। তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন। সকলের সামনে প্রভুর চরণ স্পর্শ করে তিনি আত্মনিবেদন করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন সংকীর্তনে আর বাধা দেবেন না।

এই মতে কাজিরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥[২]

দিন যায়।

গৌর ভগবানের এখন প্রেমবিকার অবস্থা।

সংসারযাত্রায় মন নেই—দেহধর্ম বিস্মৃত হয়েছেন।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।
২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কানে হরিধ্বনি শুনলেই মূর্ছা যান।

আগের মতো উদ্দণ্ড কীর্তন করতে আর পারেন না।

প্রেমানন্দে বিভোর তাঁর দুই চোখের প্রেমাশ্রু ধারা আর শুকায় না। তাঁর এই অবস্থা দেখে ভক্তরা উদ্বিগ্ন হন, উদ্বিগ্ন হন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। গয়া থেকে ফিরবার পর এই ভাবটা গৌরহরির মধ্যে একবার পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর সে ভাব ক্রমশ পরিবর্তন হয়, এবং গৃহস্থালিতে মনোনিবেশ করেন। সেটাও তিনি করেছিলেন শুধু জননী ও জায়ার মনস্তুষ্টির জন্য। এখন আবার ছেলের সেই ভাব দেখে শচীমাতার মনে জাগে বিষম চিন্তা আর নবীনা বিষ্ণুপ্রিয়ার চাঁদমুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিঃশব্দে ঝরে এক প্রেমবিধুরার অশ্রুধারা।

সংকীর্তনলীলারঙ্গ শেষ হয়েছে গৌর ভগবানের।

তার কৃপায় নদীয়ায় প্রায় সকল লোকের ভক্তিলাভ হয়েছে।

উপযুক্ত ভক্তদের তিনি দান করেছেন গোলকের সম্পত্তি—প্রেমধন।

এখন তিনি নিজের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে আছেন। বিষ্ণুপূজাও করতে পারেন না। পূজায় বসলে চোখের জলে কাপড় ভিজে যায়। এখন আর তিনি শ্রীবাস অঙ্গনেও যেতে পারেন না। দিনকে বলেন রাত, রাতকে দিন—এমনই অবস্থা হয়েছে তার। সম্পূর্ণ প্রেমবিকার অবস্থা। সকল ভক্তদের গলা ধরে প্রেমাবেশে প্রভু সর্বক্ষণ করুণ স্বরে ক্রন্দন করেন। সে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনলে প্রাণ যেন ফেটে যায়। এই সময়ে তাঁর মনে নানাভাবের তরঙ্গ উঠতে থাকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তাঁর হৃদয়কে মথিত করতে থাকে।

এই মনে আনন্দে আনন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥
নারিল নারিল এথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব শ্রীল বৃন্দাবন ভূমি॥
...　　...　　...

ক্ষণে দন্তে তৃণ ধরি করুণা করিয়া।
ফুকারি ফুকারি কান্দে চৌদিকে হেরিয়া॥
এ ভব সংসার আমি কেমনে তরিব।
সে নন্দনন্দন পদ কোথা গেলে পাব॥
হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ॥[১]

পুত্রের সংসার বৈরাগ্যভাব দেখে শচীমাতার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। চতুর্দশী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ারও সেই একই অবস্থা। শচীমাতার মন বলছে, বিশ্বরূপ যা করেছেন, বিশ্বম্ভরও তাই করবেন। কিন্তু পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে তিনি কারো কাছে খুলে কিছু বলতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার আহার নিদ্রা নেই, নিরন্তর মনের মধ্যে ধূ-ধূ আগুন জ্বলছে। তাঁর একমাত্র বান্ধবী কাঞ্চনমালা। প্রতিবেশিনী এই ব্রাহ্মণকন্যা এখন সর্বদা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছেই থাকেন। নানা কথায় সখীর মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কখনো নির্জনে বসে দুই একটি মনের কথা সখী কাঞ্চনকে বলেন। মিশ্র-ভবনে এখন বৈরাগ্যের বিশুদ্ধ পরিবেশ। গৌরহরি সকলকেই বৈরাগ্য শিক্ষা দিচ্ছেন। এ যে তাঁর স্বধর্ম।

গৌরাঙ্গ বলেন আমার বৈরাগ্য স্বধর্ম।
বৈরাগ্য ছাড়িয়া আমা নাহি কোন কর্ম॥[২]

একদিকে তীব্র কৃষ্ণবিরহ, অন্যদিকে তেমনি বৈরাগ্য—গৌর ভগবানের যখন এই অবস্থা, তখন একদিন নবদ্বীপে হঠাৎ এলেন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। নাম কেশব ভারতী। কাটোয়াতে কুটীর নির্মাণ করে নির্জনে সাধন-ভজন করতেন তিনি। প্রভুর নাম শুনে নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। এই সাক্ষাৎ ছিল নিয়তি-নির্দিষ্ট। গৌরাঙ্গকে দেখেই তিনি মহানন্দ লাভ করলেন। প্রভুর প্রতি অঙ্গের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন। সে অপরূপ রূপরাশি কেশব ভারতীর মন কেড়ে নিলো।

ইনি তো সামান্য মানুষ নন।

১,২ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

মানুষের তো এতো রূপ হয় না।

এমন বিশ্ববিমোহন রূপ তো মানুষে সম্ভব নয়।

ইনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান।

মনে মনে এইরকম চিন্তা করছেন কেশব ভারতী। গৌরহরির তখন ভক্তভাব। কেশব ভারতীর সামনে তিনি যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছেন অতি দীনভাবে। এতক্ষণ বাদে বাক্যালাপ করলেন অতি কষ্টে. কাঁদতে কাঁদতে।

—সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনি কৃষ্ণভক্ত। শ্রীকৃষ্ণে আপনার দৃঢ় অনুরাগ।

—কৃষ্ণে অনুরাগ তোমারও তো কম নয় দেখছি। তোমার দুই নয়নের প্রেমাশ্রু. এই দীনহীন ভাব—সবই তো কৃষ্ণানুরাগের লক্ষণ।

—বলতে পারেন কতো দিনে কৃষ্ণের চরণ দর্শনলাভ হবে আমার? কোথায় গেলে আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে পাব?

বলতে বলতে প্রেমাবেগে প্রভুর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। সেদিন কেশব ভারতী মিশ্রভবনে অতিথি হলেন। সন্ন্যাসী দেখলেই শচীমাতার প্রাণ চমকে উঠতো। আজ আবার সেই সন্ন্যাসী তাদের বাড়িতে অতিথি তাঁর সঙ্গে নিমাইচাঁদ নির্জনে বসে কি কথাবার্তা বলছেন। শচীমাতার প্রাণ উড়ে গেল। বিশ্বরূপের কথা তাঁর মনে পড়লো তিনি চিন্তায় অস্থির হলেন। পরের দিন শ্রীবাস পণ্ডিত কেশব ভারতীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তখন সুযোগ বুঝে শচীদেবী ছেলের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন: নিমাই! এই সন্ন্যাসীটি কে? ওর সঙ্গে তুমি কি আলাপ করছিলে? তোমার ভাব-গতিক দেখে আমার মনে বড়ো ভয় হয়েছে।

—মা! এই সন্ন্যাসীর নাম কেশব ভারতী। ইনি পরম কৃষ্ণ ভক্ত। এঁর সঙ্গে আমি কৃষ্ণকথা বলছিলাম।

—তুই কি সন্ন্যাসী হবি. নিমাই?

—তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কোন কাজই করব না।

আজ দশ বছর হলো বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। দশ বছর বাদে এলো বিশ্বম্ভরের পালা। কেশব ভারতী চলে যাওয়ার পর ছয় মাস কাল প্রভু পরমানন্দে মাতা ও পত্নী নিয়ে সংসারসুখে মগ্ন রইলেন। তারপর মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসের শেষ রাত্রিতে নবদ্বীপচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। সুদূর অতীতে এমনি এক রাত্রিতে নিদ্রিতা যশোধরার সুন্দর মুখচ্ছবিটি নয়ন ভরে দেখে ভগবান বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেছিলেন বিশ্বমানবের কল্যাণে। আজ ঠিক সেইভাবে নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানি নয়ন ভরে শেষবারের মতো দর্শন করে ধীরে ধীরে নিমাই পণ্ডিত গৃহত্যাগ করলেন।

তখন বাড়ির বাইরে তাঁর আদেশমত অপেক্ষা করছিলেন নিত্যানন্দ ও আচার্য চন্দ্রশেখর। গৃহত্যাগের সময় থেকেই এই দুজন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জননী ও জন্মভূমির উদ্দেশে প্রণাম করে গঙ্গাতীরের দিকে যাত্রা করলেন গৌরহরি। নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গ নিলেন নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর। নদীয়ার আকাশ অন্ধকার করে অন্তর্হিত হলেন নবদ্বীপচন্দ্র। গৃহত্যাগ করলেন তিনি রাত্রির অন্ধকারে।—নদীয়ার ভক্তরা কেউ তা জানল না। জানতে পারলেন না শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

গঙ্গাপার হয়ে নিমাই চললেন উন্মত্তভাবে কাটোয়ার পথে। সঙ্গে আছেন নিজ ভৃত্য গোবিন্দ কর্মকার আর অন্তরঙ্গ ভক্ত মুকুন্দ দত্ত। আছেন নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর। মাঘ মাসের নিদারুণ শীত। সেই প্রচণ্ড শীতে ভিজে কাপড় পরে, ভিজে মাথায় কনককান্তি গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উচ্চৈঃস্বরে হরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে চলেছেন কাটোয়ার পথে। এই দৃশ্য যে-কোন চিত্রশিল্পীর আকাঙ্ক্ষিত। তাঁর মুখে অবিরাম হরিধ্বনি, দুই চক্ষে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা—কোন দিকে লক্ষ্য নেই।

সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে যখন প্রভু কাটোয়া নগরে এসে উপনীত

হলেন। আরো দুজনকে—ব্রহ্মানন্দ ও গদাধর—তিনি এখানে আসতে আদেশ করেছিলেন। সবশুদ্ধ পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে নদীয়ার অবতার সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এলেন কাটোয়া নগরে। মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। গঙ্গাতীরে একটি বটগাছের তলায় বসলেন তিনি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে প্রভু চকিতের ন্যায় উঠলেন। তাঁর সঙ্গী পাঁচজনও তাঁর সঙ্গে উঠলেন। তারপর?

আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয় বর্গের সংহতি॥[১]

ভারতী ঠাকুরকে দেখেই প্রভু তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তারপর করজোড়ে তাঁর কাছে প্রেমাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন নিজ মনের কথা। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। তাঁর নবীন বয়স। তাঁর বৃদ্ধা মা ও নবীনা স্ত্রী বর্তমান। এ কথা যে শুনলো তার আর দুঃখের অবধি রইল না। ভারতী ঠাকুরের সামনে বসে আছেন নবদ্বীপচন্দ্র। বসে আছেন বিনীত ভাবে করজোড়ে। মুখে তাঁর শুধু একটিমাত্র কথা: আমাকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করে কৃতার্থ করুন। আমি আপনার শরণাগত দাস।

কিন্তু কি মন্ত্র দেবেন কেশব ভারতী?

তখন গৌর ভগবান স্বয়ং ভারতী ঠাকুরের কানে গোপনে বললেন একটি মন্ত্র। তখন বিপুল ভাবান্তর দেখা গেল তাঁর মধ্যে। বুঝলেন নদীয়ার এই ব্রাহ্মণ তনয়টি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। এইভাবে প্রভু নিজে প্রথমে কেশব ভারতীর মন্ত্র-গুরু হলেন। তখন ভারতী ঠাকুর গৌরহরিকে সম্বোধন করে বললেন: 'সন্ন্যাস করাব তোমা শুনহ নিমাঞি।' রাত্রি প্রভাতে যথা শাস্ত্র সন্ন্যাস দিলেন ভারতী ঠাকুর নিমাই পণ্ডিতকে তাঁরই আদেশে, তাঁরই দেওয়া মন্ত্রে। মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র, শিখাসূত্র নামগোত্র সব বর্জন করে গৌরহরি সন্ন্যাসী হলেন। হাতে উঠলো দণ্ড কমণ্ডলু। গুরু শিষ্যের নতুন নামকরণ করলেন: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। উপস্থিত সকলের উচ্চ হরিধ্বনিতে কাটোয়ার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

॥ নয় ॥

সন্ন্যাসের পরের দিন।

সেদিনটা কাটোয়াতে থেকে গেলেন গৌরহরি গুরুর আদেশে

সমস্ত দিন অতিবাহিত হয় তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।

গুরু ও শিষ্য দুজনেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। সকলেই দেখলো আত্মহারা হয়ে গুরু শিষ্যের এই অদ্ভুত প্রেমনৃত্য। কবি লোচনদাস এই দৃশ্য এঁকেছেন এইভাবে :

> সকল বৈষ্ণবগণ করে সংকীর্তন।
> গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন॥
> কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে।
> ঠাকুর নাচায় হরি বোলে সর্বলোকে॥
> প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে পাসরে আপনা।
> ব্রহ্মসুখ অল্প করি মানয়ে দুজনা॥[১]

এইভাবে অতিবাহিত হয় সারা রাত। সকালবেলায় গুরুর কাছে বিদায় চাইলেন নবদ্বীপচন্দ্র। তারপর কেশব ভারতীকে প্রদক্ষিণ করে তিনি কাটোয়া পরিত্যাগ করলেন। প্রথমে ধীর মন্থর গতিতে, তারপর তিনি ছুটতে থাকেন প্রেমাবেশে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, হরিনাম ভিন্ন কোনো কথা তিনি শুনতে পান না। সোনার শরীর ধূলায় ধূসর, কোমল রাঙা পায়ে বিঁধছে কুশাঙ্কুর—প্রেমানন্দে বিভোর নবীন সন্ন্যাসী কাঁদতে কাঁদতে পথে চলেছেন। সঙ্গে গোবিন্দ কর্মকার—কাঁধে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ, প্রভুর করঙ্গ, কৌপীন কটিসূত্র দিয়ে তাতে বেঁধে নিয়েছেন।

অসংখ্য লোক চলেছে প্রভুর সঙ্গে।

সকলেই পেছনে-পেছনে দৌড়চ্ছেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

ভক্তবৃন্দ ; কিন্তু কেউ তাঁর নাগাল পাচ্ছেন না। প্রভু একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন। আচার্য চন্দ্রশেখরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আচার্যও দৌড়ে এসে প্রভুকে কোলে করে ধরলেন। সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে তাঁকে কৃতার্থ করে প্রভু কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

গৃহে চল তুমি সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সভারে আমি চলিলাম বনে ॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিও মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্বক্ষণে ॥[১]

এই কথা কয়টি বলেই আর কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করে প্রভু আবার প্রেমানন্দে হরি হরি বলতে বলতে ছুটতে থাকেন উর্ধ্বশ্বাসে। নিত্যানন্দ ও গদাধর তাঁর সঙ্গেই আছেন।

পশ্চিমদিকে চলেছেন গৌর সন্ন্যাসী।

এখনো তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। কাটোয়াবাসী তাঁকে ছেড়ে ঘরে ফিরতে পারছে না। দূর থেকে প্রভু তাদের প্রতি করেন কল্যাণ দৃষ্টিপাত। দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। তখন অনেকে ছুটে এসে তাঁর সম্মুখবর্তী হয়। তারা সবাই কেঁদে আকুল। তখন তিনি তাদেরকে পরম আদরের সঙ্গে মধুর কথায় বলেন :

সভে ঘর যাহ লহ গিয়া হরিনাম।
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ ॥
ব্রহ্মা শিব শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সভার শরীরে ॥[২]

এই বলে প্রভু আবার ছুটতে থাকেন। মুখে তাঁর শুধ 'হরি হরি' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি। জনসঙ্ঘ আর তার নাগাল পায় না। তারা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। প্রভুর সঙ্গে রইলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ আর গোবিন্দ। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পরের দিন কাটোয়াতেই অতিবাহিত করেন। পরের দিন পশ্চিম মুখাভিমুখী হয়ে বনপথে প্রবেশ করলেন রাঢ়দেশে।

১,২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়দেশ ॥[১]

নবীন সন্ন্যাসী প্রেমোন্মত্ত হয়ে পথে চলেছেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সারা পথই তিনি নৃত্য করতে করতে চলেছেন। ক্রমে তিনি রাঢ়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন। চারদিকে অসংখ্য অশ্বত্থ গাছ। তার মধ্যে লতায় ঢাকা সুরম্য কুঞ্জ। সেখানে বহু জন্তুগণ নির্ভয় হৃদয়ে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়ারত রয়েছে। স্বভাব সুন্দর মনোরম বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। রাঢ়ের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভুর মন হরণ করলো।

আবিষ্ট হয়ে অপূর্ব বনশোভা দেখছেন, আর প্রেমভরে মধুর অঙ্গ ভঙ্গী করে নৃত্য করছেন। সঙ্গীরা কীর্তনের সুর ধরেছেন। প্রভু প্রেমানন্দে মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার গর্জন করছেন আর দুই বাহু তুলে 'বোল বোল' ধ্বনি করছেন। বনের পশুপাখি জীবজন্তু পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর এই অপূর্ব প্রেম দেখে, তাঁর কাছে এসে একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। এমনই হয়। ভগবানের অপরূপ রূপ সর্বচিত্তাকর্ষক। স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত তাঁর রূপমুগ্ধ।

রাঢ়দেশ ভক্তিশূন্য দেশ।

এখানে কারো মুখে কৃষ্ণনাম নেই।

কেউ কৃষ্ণকীর্তন করে না। এজন্য মনের মধ্যে দারুণ দুঃখ পেয়ে সঙ্গীদের প্রতি করুণ নয়নে চেয়ে প্রভু কাঁদতে কাঁদতে বলেন—ভক্তিশূন্য দেশে আমি কেন এলাম? এদেশের লোক কেউ আমার জীবনসর্বস্ব কৃষ্ণের নাম করে না, তাদের মুখে নেই হরিনাম। প্রভু তখন একটা মাঠের মধ্যে অচেতনপ্রায় হয়ে আছেন, ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। এমন সময়ে শিশুকণ্ঠে সেই জনশূন্য মাঠের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন মধুর হরিধ্বনি। তারপরেই কয়েকটি রাখাল বালক 'হরিবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে করতে প্রভুর দিকে ছুটে এল।

---

১ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

প্রভু বিস্মিত। রাখাল ছেলেদের মুখে হরিনাম শুনে তিনি আনন্দে বিহ্বল। তখন তিনি নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, এখান থেকে গঙ্গা কতো দূর ?

—গঙ্গা এখান থেকে এক প্রহরের পথ।

তখন প্রভু হেসে বলেন: এ মহিমা কেবল গঙ্গার। গঙ্গার বাতাস এখানে লেগেছে, তাই কৃষ্ণনাম শুনলাম। আমি গঙ্গা স্নান করব।

এই বলে তিনি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গঙ্গাতীরের দিকে ছুটতে লাগলেন। মত্ত সিংহগতিতে তিনি পথে ছুটে চলেছেন। সঙ্গীরা কেউ নাগাল পায় না। শুধু নিত্যানন্দ রইলেন তাঁর সঙ্গে। সন্ধ্যায় প্রভু শান্তিপুরের এপারে গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছালেন। গঙ্গা দেখে তাঁর অপার আনন্দ। নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ গঙ্গাস্নান করলেন। 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। তারপর গঙ্গাজল পান করে হলেন পরিতৃপ্ত। ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করে করজোড়ে স্তুতি করতে লাগলেন :

> প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
> শিব যে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
> সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
> তার বিষ্ণুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
> পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
> তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥[১]

গঙ্গাস্নান সেরে গঙ্গাতীরে বসে নবীন সন্ন্যাসী আবার জ্ঞান হারালেন। সেই অবসরে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, তুমি আগে পার হয়ে শান্তিপুরে যাও। অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলবে, একটা নৌকা নিয়ে তিনি যেন তাড়াতাড়ি এপারে আসেন। আমি সেই নৌকায় প্রভুকে নিয়ে শান্তিপুরে যাব।

—প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ নবদ্বীপের লোক জানবে না ?

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

—নিশ্চয়ই জানবে, চন্দ্রশেখর। শান্তিপুর থেকে তুমি নবদ্বীপে গিয়ে সবাইকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলবে।

—প্রভু কি এখন শান্তিপুরনাথের ভবনেই অবস্থান করবেন?

—হ্যাঁ। পরে আমি প্রভুর আদেশ নিয়ে নবদ্বীপে গিয়ে সবাইকে শান্তিপুরে আনব।

চন্দ্রশেখর চলে গেলেন।

তু'দিন পরে নৌকা নিয়ে অদ্বৈত আচার্য এসে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে প্রভুর সন্ন্যাসবেশ ও মুণ্ডিতমস্তক দেখে তিনি হাহাকার করে কেঁদে ওঠেন। এদিকে গঙ্গাতীরে মুদিত নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন গৌরহরি। তখনো তিনি বৃন্দাবনের ভাবে বিভোর। তাই অদ্বৈতকে দেখে বলেন, আচার্য! আপনি কি করে জানলেন আমি বৃন্দাবনে এসেছি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

অদ্বৈত বুঝলেন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি কেঁদে আকুল হয়ে তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন। অমনি সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁর আজানুলম্বিত বাহু তুটি দিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন। নৌকায় উঠে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি এলেন শান্তিপুরে। এখন গৌর আনা-গোসাঞির হাতে গৌরাঙ্গধন সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন নিত্যানন্দ।

গৌরহরির গৃহত্যাগের পর নবদ্বীপবাসীর অবস্থাটা হয়েছিল ঠিক যেন জীয়ন্তে মরা। নিদ্রিতা তরুণী বধূকে পালঙ্কে শায়িত রেখে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করেছিলেন। শচীমাতার মাথায় সেদিন যেন বাজ ভেঙে পড়েছিল যখন বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে এসে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বললেন, মাগো! তোমার ছেলে ঘরে নেই। বুঝি আমার কপাল ভেঙেছে। নিমাই যে গৃহত্যাগ করবে, তা তিনি জানতেন, তবে অমনভাবে লুকিয়ে তাঁকে না বলে চলে যাবে,—তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। পুত্রবধূকে আর কি আশ্বাস দেবেন তিনি?

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার যে অবস্থা, নদীয়ার ভক্তগণের অবস্থাও ঠিক তেমনি। তাঁরা প্রথমে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এসে জানলেন যে

প্রভু গৃহত্যাগ করেছেন। নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ অন্ধকার করে চলে গেছেন। তখন তাঁরা সকলে এসে মিশ্রভবনের আঙিনায় একত্রিত হলেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখে তাঁরা শোকের সাগরে ডুবলেন। শান্তিপুরে যখন এই সংবাদ এলো তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অদ্বৈত আচার্য গৌরাঙ্গ-বিরহে একেবারে ধৈর্য হারালেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। সকলকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বৃদ্ধ নিজেই কেঁদে আকুল হচ্ছেন। মুরারি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আপনি একি করছেন? অনিশ্চিত বিষয় নিয়ে কেন এত বিলাপ করছেন? এই কথা শুনে তিনি একটু শান্ত হলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন প্রভুর কোনো সংবাদ এলো না তখন নদীয়ার লোক শোকসাগরে ভাসছে। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি সবাই শোকে উন্মত্ত হয়েছেন। তিন দিনের দিন চন্দ্রশেখর শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে এলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের সংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি।

কিন্তু নদীয়ার ভক্তদের কাছে—শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে—তিনি কেমন করে মুখ দেখাবেন? এই চিন্তায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতীরে একটি নির্জন স্থানে একাকী বসে অনুচ্চ স্বরে আক্ষেপ করতে থাকেন তিনি। তখন সন্ধ্যাকাল। গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে এসেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত। হঠাৎ আচার্যরত্নের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে সেই দিকে ছুটলেন। চন্দ্রশেখরের কাছে সকল সংবাদ শুনলেন। মুহূর্তমধ্যে সেই দুঃসংবাদ রটে গেল নবদ্বীপে। ভক্তরা সবাই গঙ্গাতীরে এসে সমবেত হলেন।

তাঁরা শুনলেন, তাদের সর্বস্বধন, শচীমাতার অঞ্চলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন, গৌরসুন্দর সন্ন্যাসী হয়েছেন। ইতোমধ্যে শচীমাতা খবর পেয়েছেন যে, চন্দ্রশেখর ফিরে এসেছেন। তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। ছেলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতে তিনি পাঠিয়েছেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে। তখন নিজেকে সংযত করে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বলেন আচার্যরত্ন: শচীমাতাকে বলো, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। জীবের মঙ্গলের জন্য এই সন্ন্যাস।

সমস্ত নবদ্বীপে গৌরহরির সন্ন্যাসের কথা বিদ্যুৎগতিতে প্রচারিত হলো। শচীমাতার কানে এ সংবাদ পৌঁছলো। তিনি আঙিনায় আছড়ে পড়ে মূর্ছা গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান চৈতন্য ছিল না। প্রতিবেশিনীরা তাঁকে ঘিরে মুখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। ভক্তরা বাইরের হাহাকার ও আর্তনাদ করছেন। ওদিকে গৃহমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মৃতবৎ পড়ে আছেন। তিনিও আজ তিন দিন জলস্পর্শ করেন নি। তাঁর কথা বলার শক্তি নেই। তাঁরও কানে গেল স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ। কাঞ্চনমালা সখীকে কোলে নিয়ে বসেছেন, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে শুধুমাত্র দুটি কথা—'হা গৌরাঙ্গ'! 'হা গৌরাঙ্গ।'

হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ!

নদীয়ার প্রত্যেকটি ভক্তের মুখে এই কথা।

ঠিক সেই সময় গৌরহরি বলছেন নিত্যানন্দকে—শ্রীপাদ! আপনি নবদ্বীপ গিয়ে সবাইকে শান্তিপুরে নিয়ে আসুন। নিত্যানন্দ যাবার উদ্যোগ করতেই, প্রভু তাঁকে ডেকে কানে কানে গোপনে কি বলে দিলেন। সবাইকে আনতে বলেছেন—সকলের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াও আছেন। প্রভু তাই তাঁকে আগেই সাবধান করে দিলেন। একজন ছাড়া আর সকলকেই শান্তিপুরে আনবেন।—সে একজন কে?

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া।

যতি সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী-মুখ দেখা নিষেধ।

ধর্মপ্রতিপালক গৌরহরি ধর্ম পালন করে লোকশিক্ষা দিলেন।

কিন্তু এই যতিধর্ম পালন করতে, আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর কোমল হৃদয় নিশ্চয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু লোকশিক্ষার জন্য আত্মসুখ তৃণজ্ঞানে তুচ্ছ করলেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বরের সকল কাজই স্বতন্ত্র। তাঁর লীলা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। নিত্যানন্দ শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ এলেন। প্রথমেই তিনি শচী আঙিনায় এসে উপস্থিত হলেন। আজ বারো দিন তিনি উপবাসী আছেন—দেহে শুধু শ্বাসটুকু আছে।

—মা! আমি তোমার নিতাই।

—আমার নিমাই কোথায় ?

—তোমার নিমাইকে শান্তিপুরে এনেছি। তিনি অদ্বৈতের বাড়িতে কুশলে আছেন।

—নিমাই কেমন আছে ?

—ভাল। তোমাকে দেখবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন। আমি তোমাকে নিতে এসেছি, মা। আজই তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব।

নবদ্বীপশুদ্ধ লোক শান্তিপুরে চললো।

শচীমাতা দোলায় করে যাবেন।

দোলা এলো মিশ্রভবনের দরজায়।

পুত্রবধূকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ঠিক করলেন শচীদেবী। এই সোনার পুতলীকে এসময় কার কাছে রেখে যাবেন ? শচীমাতা এইরকম চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন সময়ে নিত্যানন্দ এসে তাঁকে বলেন, মা ! সবাই প্রস্তুত। দোলা এসেছে, চলো মা ! শান্তিপুরে চলো। তোমার নিমাইচাঁদকে দেখবে চলো ?

—বৌমাকে নিয়ে যেতে হবে।

—মা ! প্রভুর নিষেধ আছে। তুমি একা চলো।

—নিতাই ! আমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি করে একলা রেখে শান্তিপুরে যাব ? কে তাকে দেখবে ?

নিত্যানন্দ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোনো উত্তর দিলেন না। তখন অন্তঃপুরে কাঞ্চনমালার গলা জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কাঁদছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর দুঃখের অবধি নেই। তিনি সবই শুনেছেন, সবই দেখছেন। তাঁর বুঝতে আর বাকি কিছু রইল না। ছিন্নমূল লতার মতো মাটিতে পড়ে মর্মভেদী স্বরে তিনি আর্তনাদ করতে থাকেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে নিয়ে শান্তিপুর যাত্রা করলেন। ভক্তদের সঙ্গে শচীমাতা চললেন শান্তিপুরের পথে, আর নবদ্বীপের শান্তিহীন শূন্য গৃহতলে লুটিয়ে পড়লেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

॥ দশ ॥

গৌর সন্ন্যাসী এখন রয়েছেন অদ্বৈত ভবনে।

তাঁর অপূর্ব সন্ন্যাসী বেশ দেখে সবাই বিমোহিত।

তাঁর শ্রীমুখে সর্বদাই উচ্চারিত হচ্ছে 'হরে কৃষ্ণ' নাম।

যারা তাঁকে আগে কখনো দেখেনি তারা তাঁর দিব্য জ্যোতিপূর্ণ প্রশান্ত সন্ন্যাস-মূর্তি দেখে মনে মনে লাভ করলো পরমানন্দ। লোচন দাস এর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

আছিল অধিক কোটি গুণ দেহ ছটা।
আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন দীর্ঘ ফোঁটা॥
গোরা গায়ে অরুণ বসন উজিয়ার।
প্রাতঃকালের সূর্য যিনি বরণ তাঁহার॥
দণ্ড করে আইল মত্ত সিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে॥[১]

কিন্তু যাঁরা প্রভুর সেই সুন্দর নবনটবর বেশ দেখেছেন তাঁদের মনে এই সন্ন্যাস-মূর্তি দুঃখের সঞ্চার করলো। মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীন পরিধান, দণ্ডকমণ্ডলুধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তাঁরা কেঁদে আকুল হলেন। তাঁরা প্রভুর মুখের দিকে ভালো করে চাইতেই পারলেন না।

গৌর-ভগবান আছেন অদ্বৈত ভবনে।

অদ্বৈত ভবনে এখন আনন্দের উৎসব।

শান্তিপুরে পদার্পণ করামাত্র প্রভুকে দর্শন করতে লোক আসছে হাজারে হাজারে। চারদিকে উঠছে অবিরাম হরিনাম। গৌর সন্ন্যাসীকে দেখে সবাই কৃতার্থ হয়। একান্তে বাক্যালাপ হয় দুজনের মধ্যে—অদ্বৈত ও সন্ন্যাসীর মধ্যে।

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

—সন্ন্যাস তো অদ্বৈতবাদীদের প্রিয়তম জিনিস। আপনি তো কৃষ্ণভক্ত। আপনার লীলা বুঝা কঠিন।

—হে আচার্য! মনে করে দেখ দেখি আমরা অদ্বৈতের সেবা করি না? তোমাতে ও ঈশ্বরেতে রূপ ও চিহ্নাদির মাত্র প্রভেদ, বস্তুত এবং তত্ত্বত অন্য কিছুরই প্রভেদ নেই।

—প্রভু! আপনি বাক্‌পতি। আপনার কাছে কথায় কেউ পারবে না।

—অদ্বৈতাচার্য! যথার্থ কথা বল শোনো। সর্বত্যাগী না হলে শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। এইজন্য আমি সর্বত্যাগী হয়েছি।

—তবু আমার মন বলছে এ আপনার কপট সন্ন্যাস।

অদ্বৈতের গৃহে প্রভু ভোজনে বসেছেন। সঙ্গে আছেন নিত্যানন্দ। বহু উপচারের আয়োজন। রেঁধেছেন অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী। গৃহদেবতা মদনমোহনকে ভোগ দিয়ে তিনজনে তিনটি পৃথক আসনে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্মুখে নানাবিধ উপকরণপূর্ণ স্তূপাকৃতি অন্নব্যঞ্জন, রাশি রাশি পায়স মিষ্টান্ন, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি সজ্জিত রয়েছে।

—আমি তো এত অন্নব্যঞ্জন খেতে পারব না।

—প্রভু! তুমি অকপটে গ্রহণ কর। যদি খেতে না পার, প্রসাদ রেখে দিও। তোমার প্রসাদ পাবার জন্য অনেক লোক আছে।

—আমি সন্ন্যাসী। উচ্ছিষ্ট রাখা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।

এইভাবে দশদিন অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করলেন প্রভু। এর মধ্যে একদিন সকালে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তরা শচীমাতাকে সঙ্গে করে শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পুত্রের সন্ন্যাস বেশ দেখে শচীমাতার মনে যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও বাৎসল্যভাবের উদয় হলো। প্রভু উঠে মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সজল নয়নে বললেন:

কান্দিয়া বোলেন প্রভু 'শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥

তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যে আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥[১]

এই বলে মাতৃভক্ত প্রভু শচীমাতাকে বার বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। ছেলের কথায় মা একটু আশ্বস্ত হলেন। তারপর তিনি নদীয়ার ভক্তদের সঙ্গে একে একে মিলিত হলেন—সকলকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন, তুষ্ট করলেন সকলকেই মিষ্ট কথায়। তাঁরা প্রভুকে একবার নবদ্বীপে নিয়ে যাবার অভিলাষ জানালেন।

তখন নবীন সন্ন্যাসী তাঁদের সবিনয়ে বলেন: আমি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছি। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিজ জন্মস্থানে বাস সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। যদি আমি তা করি,—লোকে নিন্দা করবে। তোমরা সকলে পরামর্শ করে আমাকে সৎযুক্তি দাও, যাতে আমার দুই কুল রক্ষা হয়। আমি তোমাদেরও পাই,—আর আমার সন্ন্যাসধর্মও রক্ষা হয়।

এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন বুদ্ধিমতী শচীমাতা।
ছেলের ধর্ম রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন তিনি।
অপত্য স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর কর্তব্যজ্ঞান খুব দৃঢ়।
সেই কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন।

তাঁর মুখের একটি কথায় হয়ত প্রভু শান্তিপুরেই বাস করতেন, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য ছেলের ধর্মাচরণে বাধা দেবেন কেন তিনি? অপত্যস্নেহের এক নতুন দৃষ্টান্ত সংসারে দেখাবেন তিনি। নিজে থেকেই তিনি তাঁর অন্তর-ভরা ধন নিমাইয়ের নীলাচলবাসের আদেশ দিলেন। প্রভুর ইচ্ছা, তিনি নীলাচলে বাস করবেন। কিন্তু সে কথা নিজে না বলে মায়ের মুখ দিয়ে বলাতে চান। তাঁর মনোভাব অদ্বৈত ও অন্যান্য

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তবৃন্দ শচীমাতাকে যখন নিবেদন করলেন তখন গৌরাঙ্গ-জননী পুত্রের ধর্মরক্ষা করতে যত্নবান হলেন। সমস্ত ভক্তদের সম্বোধন করে তিনি বললেন :

তিহোঁ যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥
নীলাচল নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গনি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥[১]

'আমি আমার নিজের সুখ বা দুঃখ কিছুই বুঝি না। নিমাইয়ের যাতে সুখ, সেই আমার প্রকৃত সুখ'—শচীমাতার এই কথাটি গৌর-ভগবানের প্রতি তাঁর বাৎসল্য ও স্নেহের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। অদ্বৈত আচার্য এই কথা গিয়ে নিবেদন করলেন প্রভুর চরণে। মা নীলাচল যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন শুনে তাঁর খুব আনন্দ হলো। অপূর্ব সন্ন্যাস বেশে ভক্তদের মাঝখানে বসে তাঁদের সম্বোধন করে, পরম দৈন্যভরে তিনি বলেন :

তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগো মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥[২]

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গৌর সন্ন্যাসী দশদিন ছিলেন শান্তিপুরে।

এক সপ্তাহ অতীত হয়েছে। প্রতিদিন শচীমাতা নিজের হাতে নানারকম শাক ব্যঞ্জনাদি রান্না করে ছেলেকে কাছে বসিয়ে খাওয়ান। প্রভু শাক ভালবাসেন, ভালবাসেন মোচার ঘণ্ট, গর্ভথোড়ের ব্যঞ্জন। অদ্বৈত জিনিসপত্রের আয়োজন করেন, সীতাদেবী সব ব্যবস্থা করেন, আর শচীমাতা বহু যত্নে রান্না করেন। মাকে সকল বিষয়ে তুষ্ট করেন নিমাই। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বলেন। শচীদেবীর মনে এখন তত দুঃখ নেই।

আরো তিনদিন প্রভু রইলেন শান্তিপুরে।

নবদ্বীপ-শান্তিপুরের ভক্তরা একত্রে মিলে দিনরাত তাঁর গুণকীর্তন করেন। প্রতিদিন তাঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হন তাঁরা। প্রতিদিন প্রভুর নৃত্যকীর্তন বিলাস দেখে পুলকিত হন। শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে যেন মহা-মহোৎসব। হরিসংকীর্তন ধ্বনিতে মুখরিত এর আকাশ-বাতাস। সেই আনন্দের মধ্যে সবাই বিস্মৃত হয়েছিলেন একজনের কথা—এক অন্তঃপুরচারিণী, নির্বাককুণ্ঠিতা চতুর্দশী নারীর কথা। তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। এমন কি শচীমাতা পর্যন্ত বিস্মৃত হলেন তাঁর দুঃখিনী পুত্রবধূকে।

অবশেষে এলো নীলাচল যাত্রার দিন।

মায়ের কাছে পুত্রের বিদায় নেবার সময় উপস্থিত।

ধীর পদক্ষেপে শচীমাতা প্রভুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন স্থিরভাবে।

তাঁর সমস্ত শরীর থরথর কাঁপছে, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। পাগলিনীর মতো আলুথালু বেশ। ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন গৌরহরি। সস্নেহে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করে, কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

নিদারুণ হিয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোমারে না দেখি এথা মরি যাব আমি॥
সভে তোর বদন দেখিবে কতবার॥
মুঞি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর॥

সভারে প্রবোধ বাছা করিলি আপনে।
আমায় প্রবোধ তুমি দিবে রে কেমনে॥
আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেল মাত্র রহিল অন্তরে॥[১]

এই প্রথম শচীদেবীর মুখে উচ্চারিত হয় পুত্রবধূর নাম।

জননীর শেষ কথাটি প্রভুর হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ করল।

মথিত হয় তাঁর কোমল হৃদয়। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে মাকে বলেন, 'মা! ঘরে গিয়ে কৃষ্ণভজন কর, তোমার সকল দুঃখ দূর হবে।' তারপর, মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে, তাঁকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে প্রভু নীলাচল যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন নিত্যানন্দ আর গদাধর, নরহরি, মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ সাতজন। প্রভুর কৌপীন বহির্বাস প্রভৃতি নিয়ে গোবিন্দ কর্মকারও তাঁর সঙ্গে চললেন। এইখানেই মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় যবনিকা পতন। এইবার আমরা দেখব তাঁর জীবনের অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত সন্ন্যাসলীলা। তখন তার বয়স চব্বিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে যখন নদীয়া-বিনোদ নীলাচল যাত্রা করেন। গৌরজীবন নাট্যের প্রথম অঙ্কের শেষ এইখানেই।

॥ এগারো ॥

নীলাচলের পথে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

আর বেশি দূরে নয় নীলাচল।

তবু তাঁর যেন আর বিলম্ব সইছে না। দ্রুত হয় পদক্ষেপ।

পথে রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করে কটকে এলেন। তিনি দর্শন করবেন সাক্ষীগোপাল। গৌর এসে দাঁড়ালেন মন্দিরে গোপালের সম্মুখে।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্তি॥
দোঁহে একবর্ণ, দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহা তেজোময় দোঁহে কমল নয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ মন, চন্দ্র বদন॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করে হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥

কিছুক্ষণ বাদে প্রভু প্রকৃতিস্থ হলেন। তখন এই সাক্ষীগোপালের ইতিবৃত্ত ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকেন নিত্যানন্দ। ভক্তরা মুগ্ধ হন সেই কাহিনী শুনে। অনেক—অনেককাল আগের কথা। একদিন বিদ্যানগর থেকে তীর্থদর্শন মানসে দুই ব্রাহ্মণ পথে বের হয়েছেন। পথেই তাঁদের পরিচয়—একজন ধনী মানী কুলশ্রেষ্ঠ—তিনি বড়ো বিপ্র; অন্যজন ধনহীন, মানহীন, কুলহীন—ছোট বিপ্র। তাঁরা দুজনেই পরম ভক্ত। দুজনে একসঙ্গে চলতে চলতে তীর্থরাজ বৃন্দাবনে উপনীত হলেন। মনের সুখে তাঁরা তীর্থের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখলেন। হঠাৎ বড়ো বিপ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজেকে অসহায় ভেবে তিনি আকুল হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছোট বিপ্র—আশ্বাস ও শান্তি নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আন্তরিক সেবায় বড়ো বিপ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। প্রবাসে এই নিঃস্বার্থ সেবার মূল্য যে কতো তা তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেন। প্রতিদানের কথা চিন্তা করলেন তিনি। ঠিক করলেন, দেশে ফিরেই তিনি নিজের মেয়েকে ছোট বিপ্রের হাতে সমর্পণ করবেন। কথাটা বললেন তাঁর উপকারী সঙ্গীটিকে। ছোট বিপ্র তখন নিজের সামাজিক মর্যাদা ও দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে, বড়ো বিপ্রকে এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধনী বিপ্র তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। গোপাল-মূর্তির সামনেই এই প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ছোট বিপ্র জানতেন, দেশে ফিরলে তাঁর সঙ্গী নিশ্চয়ই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনই বাধা দেবেন। অধিকন্তু, ছোট বিপ্রই সকলের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবেন। তাই নিরুপায় হয়ে তিনি গোপাল-বিগ্রহকেই সাক্ষী মানলেন। বললেন, আমার তো আর কেউ নেই, এই অসম্ভব বাক্যের তুমিই রইলে সাক্ষী। ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যাতে রক্ষা পায় তা তুমি দেখো, আর আমাকেও যেন মিথ্যার জালে জড়াতে না হয় তাও দেখো। মনে রেখো, গোপাল, দরকার হলে, আমি তোমাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকব।

তীর্থভ্রমণ শেষ করে ব্রাহ্মণ দুজন দেশে ফিরলেন। বড় বিপ্র নিজের প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হন নি। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে জানালেন তীর্থবাক্যের কথা। শুনে সবাই একেবারে বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কেউই এই অসম্ভব শপথবাক্য সমর্থন করল না। প্রতিবাদে গৃহ মুখর হয়ে ওঠে। বড়ো বিপ্র পড়লেন চরম সঙ্কটে। তখন তাঁর ছেলেরা তাঁকে এই বিষয়ে নীরব থাকতে বাধ্য করলো। অনেক দিন কেটে গেল। বড়ো বিপ্রের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ছোট বিপ্রই একদিন তাঁর প্রার্থনা নিয়ে এসে হাজির হলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রতিশ্রুতি। তখন বড়ো বিপ্রের ছেলেরা এসে তাঁকে গালিগালাজ করে মারতে উদ্যত হয়। বড়ো বিপ্র ছেলেদের ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন, তাঁর অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল, তবু সত্য বলার সাহস হলো না তাঁর।

ছোট বিপ্র বুঝতে পারলেন তীর্থবন্ধুর অবস্থাটা। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে যখন সব ঘটনা বললেন, তখনো বড়ো বিপ্র নীরব। শুধু একবার বললেন, আমার কিছু স্মরণ নেই। ছেলেরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। উত্তেজিত হয়ে তারা বলে উঠলো, আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে বিদেশে একলা পেয়ে এই ধূর্ত ধুতুরা খাইয়ে পাগল করে কি কথা আদায় করেছে তার কি মূল্য? আমাদের বাবা কি এইরকম কুলেশীলে হীন মূর্খের হাতে কন্যাদান করার কথা বলতে পারেন? সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো—অসম্ভব! ছোট বিপ্রের

ক্ষীণ স্বর সভার কোলাহলে ডুবে যায়। শেষে তিনি কোনো উপায়ই দেখতে না পেয়ে বললেন, বৃন্দাবনের গোপাল এর সাক্ষী আছে।

বৃন্দাবনের গোপাল সাক্ষী আছে! উচ্চ পরিহাসের ঢেউ বয়ে যায় সভায়। সবাই বলে ওঠে, বেশ, সাক্ষী আনা হোক; বড়ো বিপ্রের অন্তরটা তখন সকলের অগোচরে একটু কেঁপে উঠেছিল। তাঁর ছেলেরা কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কলিকালে পাষাণ বিগ্রহ যে সাক্ষ্য দিতে আসবে না এ তাদের জানা। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে ছোট বিপ্র চললেন বৃন্দাবনে। বিয়ে হলো না দুঃখ সেজন্য নয়, ব্রাহ্মণের তীর্থবাক্য মিথ্যা হলো, সেই কথা তিনি যতই চিন্তা করেন ততই তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে। তিনি বুঝলেন আজ তিনি যেমন নিরুপায়, বড়ো বিপ্রও তাই। সুতরাং তাঁর ব্যাকুলতাটা তীর্থবন্ধুর ধর্মরক্ষার জন্যই বেশি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে গোপাল বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন:

ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি সাক্ষী তুমি দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥[১]

তখন বিগ্রহরূপী গোপাল হেসে ছোট বিপ্রকে বলেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে চলে যাও, সেইখানে সভা ডাকো, অন্তরীক্ষ থেকে দৈববাণী দ্বারাই আমি সাক্ষ্য দেব—এই প্রতিমা-স্বরূপে তো আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না। বিপ্র বললেন, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করেও সাক্ষ্য দাও তবু কেউ তা বিশ্বাস করবে না। এই প্রতিমা-স্বরূপেই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। যদি প্রতিমা হয়ে কথা বলতে পারো তবে চলতেই বা পারবে না কেন? আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না, ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার জন্য আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে।

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সাক্ষী এবার নরম হলেন, বললেন—বেশ, তাই হবে। তুমি যাত্রা করো, আমি তোমার পেছনে পেছনে যাব। তবে একটা শর্ত আছে, তুমি পেছন ফিরে তাকাতে পারবে না; শুধু আমার পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাবে। যদি ফিরে তাকাও তবে আমি আর এক পা-ও অগ্রসর হব না। যাবার আগে একটু অন্নভোগ দেবে, তাই খেয়ে তোমার সঙ্গে যাব।

ব্রাহ্মণ সানন্দে শর্তে রাজী হয়ে বিদ্যানগরের পথে যাত্রা করলেন। অনেকদিন বাদে তিনি এসে উপস্থিত হলেন গ্রামের সীমানায়। সারাটা পথ তিনি একটিবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকালেন না—শুধু নূপুরের ধ্বনি শুনেছেন। গ্রাম প্রান্তে এসে তাঁর মনে হলো, আজ একবার নিজের চোখে গোপালকে দেখা দরকার। নইলে গ্রামের লোক ডেকে এনে যদি সাক্ষীকে দেখাতে না পারি তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। গ্রামে যখন এসে গেছি তখন আর ভয় কি? গোপাল এখানে থেকে গেলেও ক্ষতি নেই। বিপ্র ফিরে তাকালেন। গোপালও অমনি হেসে সেখানেই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। সারা গ্রামে এই সংবাদ রটে যায়—সকলেই ছুটে আসেন এই অভিনব সাক্ষী দেখবার জন্য। এ কি অসম্ভব ঘটনা। বিদ্যানগরবাসীর আর আনন্দের সীমা রইল না—ভক্তিতে, আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন সকলে। দুই ব্রাহ্মণের অনুরোধে বৃন্দাবনের গোপাল সেইখানেই রয়ে গেলেন। বিদ্যানগরের রাজা একটি সুন্দর নতুন মন্দিরে গোপালের প্রতিষ্ঠা করলেন। বড়ো বিপ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে ছোট বিপ্রের হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করলেন।

কিছুদিন পরের কথা। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেব হঠাৎ আক্রমণ করলেন বিদ্যানগর। যুদ্ধে তিনিই জয়ী হলেন। গোপালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিগ্রহটিকে নিজের রাজধানী কটকে নিয়ে এলেন। মহাসমারোহে কটকে সাক্ষীগোপালের প্রতিষ্ঠা হলো। উড়িষ্যার রাণী একদিন নবনির্মিত মন্দিরে গোপাল দর্শন করতে এলেন। বিগ্রহের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি নিজের

গা থেকে মণিময় অলঙ্কারে গোপালকে সাজালেন। রাণীর নাকে ছিল একটি সুন্দর নিটোল মুক্তা। ইচ্ছা হলো সেটিও গোপালকে পরিয়ে দেন। কিন্তু পাষাণ বিগ্রহের নাকে কোনো ছিদ্র পাওয়া গেল না। রাণী মনের কষ্ট মনে নিয়েই প্রাসাদে ফিরে এলেন। গভীর রাত। পালঙ্কের ওপর তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন অবসর বুঝে স্বপ্নে গোপাল এসে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়ালেন। রাণীর শয়নকক্ষটি আলোয় আলো হয়ে উঠলো। তিনি চমকে উঠলেন। তাঁকে আরো চমৎকৃত করে মধুর কণ্ঠে গোপাল বললেন, আমার নাকে মুক্তা পরালে না কেন? এই তো নাকে ফুটো রয়েছে। ছোটবেলায় মা যশোদা কি আমার নাকে গয়না পরান নি?

রাণীর স্বপ্ন ভেঙে যায়। এ কি সত্য? রাত্রি প্রভাত হলো। দ্রুত একটা পালকিতে চড়ে তিনি মন্দিরে গোপালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটুকরো সিক্ত বস্ত্র দিয়ে ঘষতে ঘষতে সত্যিই গোপালের নাকে একটি ফুটো দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর বিস্ময়ের সীমা নেই। অন্তর ভরে যায় আনন্দে। নিজের নাকের মুক্তাটি পরিয়ে দিলেন বিগ্রহের নাকে। মুক্তা পরে গোপালের রূপ যেন আরো নয়নাভিরাম হয়ে উঠল। রাণী তাঁর জীবন সার্থক মানলেন।

এতক্ষণ প্রভু পরমানন্দে শুনছিলেন সাক্ষীগোপালের কাহিনী। দেখলেন গোপালের অঙ্গে তাজো রাণীর দেওয়া সেই আভরণ, নাকে সেই মুক্তা। তিনি বিমুগ্ধচিত্তে গোপালের রূপ-সুধা পান করতে লাগলেন। পরের দিন সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে, নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তিনি সঙ্গীদের নিয়ে। হাতে সন্ন্যাসীর দণ্ড।

যাত্রীদল ভুবনেশ্বর তীর্থ অতিক্রম করে কপোতেশ্বরে এলেন। শ্রীক্ষেত্র এখন আর বেশি দূরের পথ নয়। পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর সন্ন্যাসের চিহ্ন দণ্ডটি নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে ভিক্ষা করতে গেলেন। দণ্ডটি যেন খুব সাবধানে রক্ষা করা হয়, এই কথা বিশেষভাবে বলে গেলেন। তখন নিত্যানন্দ কি করলেন?

আগে বাগে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥
'অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এতো যুক্তি নহে॥'
এত বলি বলরাম[১] পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড[২]

নিত্যানন্দ কেন দণ্ড ভেঙেছিলেন? বৈষ্ণব মহাজনদের অভিমত এই যে, যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁর পক্ষে বিধিনিষেধ অর্থহীন। কেবল লোককল্যাণের জন্যই জননী, পত্নী ও ভক্তদের কাঁদিয়ে তাঁর এই সন্ন্যাস গ্রহণ, সন্ন্যাসের সমস্ত কঠোরতা বরণ, তার উপরে আবার এই যতিচিহ্ন দণ্ড ধারণ। এ যেন নিত্যানন্দ কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না—বেদনায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। অথচ প্রভুর সামনে কোনো প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। আজ সুযোগ বুঝে নিতাই দণ্ডখানি ভেঙে তিন টুকরো করে ফেললেন। এই কথা যখন গৌরহরির কানে এলো, তিনি নিত্যানন্দকে ঈষৎ ক্রোধে এবং দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—দণ্ড কেমন করে ভাঙলো?

—তুমি প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে, তোমাকে রক্ষা করতে গিয়ে দণ্ডটি ভেঙে গেছে।

—আমার তো সম্বলের মধ্যে ছিল এই একমাত্র দণ্ড, সেটাও তুমি ভেঙে ফেললে? জানো না কি সর্ব দেবতার অধিষ্ঠান এর মধ্যে?

—তোমার দণ্ডে কি আছে আমি তা জানি না, একখণ্ড বাঁশ শুধু ভেঙেছি। তাতেই যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ইচ্ছা মতো শাস্তি দিতে পারো। আমি প্রস্তুত।

১ গৌর অবতারে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ স্বয়ং সংকর্ষণ, অনন্তদেব।
২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

—যাক, এখন হয় তোমরা আগে যাও, নতুবা আমাকে আগে যেতে দাও।

—তাই হোক, তুমি আগে চলো, আমরা সবাই পেছনেই চলব, সঙ্গে যাব না।

॥ বারো ॥

সিন্ধুতীরে বট মূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্যস্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তভু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥[১]

এই নীলাচলে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

অচল দারুব্রহ্ম দর্শনে চলেছেন সচল গৌরব্রহ্ম।

দূর থেকে দেখা গেল বহু প্রত্যাশিত জগন্নাথ দেউলের চূড়াগ্রভাগ। আবেশে, প্রেমে নৃত্য করতে করতে প্রভু এই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে লাগলেন:

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত সুবদনো বালগোপালমূর্তি॥

এই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে কতোবার আছাড় খেয়ে তিনি মাটিতে পড়তে লাগলেন।

অবশেষে প্রভু এসে পৌছলেন নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরের দরজায়। অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তিনি, বিলম্ব যেন আর সইছে না তাঁর। ঐ যে দু' হাত বাড়িয়ে জগন্নাথ তাঁকে ডাকছেন।

সময় সীমার মধ্যে বিধৃত মহাপ্রভুর জীবনের আয়ুষ্কাল বিস্তৃত ছিল

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত। এর প্রথম পর্ব শেষ হয় তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে। কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে তাঁর জীবনলীলার পর্ব ভাগ করেছেন :

চব্বিশ বছর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যে যে লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
শেষ লীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নামভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাঁহা যেই লীলা মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে॥[১]

নীলাচলে মহাপ্রভুকে আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনের মধ্যপর্বে। এই পর্বেই প্রকটিত হয়েছে তাঁর জীবনের সর্বোত্তম ভাব—এই পর্বেই তাঁর জীবনের দুই তট দিয়ে শতধারে প্রবাহিত হয়েছে কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ-ভক্তি। তাঁর জীবনের এই পর্বটি যেমন নিগূঢ়, তেমনি অনির্বচনীয়। গৌরলীলায় এই নীলাচল পর্বটি একান্তভাবেই অনুভবের বিষয়, আলোচনার বিষয় নয়; আস্বাদনের বিষয়, বিচার-বিতর্কের বিষয় নয়।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পুরী, জগন্নাথের মন্দির।

মহাপ্রভু ব্যাকুল হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হলেন শ্রীমূর্তির দিকে। নিজেই নিজেকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন তিনি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তিনি একেবারে মূর্তির কাছে উপস্থিত হলেন। হৈ-হৈ পড়ে যায় মন্দিরের মধ্যে। একজন সাধারণ মানুষ শ্রীমূর্তি স্পর্শ করবে! পাণ্ডারা অমনি মহাপ্রভুকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। বেদীর উপরে অবস্থিত জগন্নাথ-মূর্তিকে নিজেরই শরীর ভেবে তিনি তখন অচেতন প্রায় হয়েছেন।

দৈবক্রমে সেই সময়ে বাসুদেব সার্বভৌম সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনিই নবদ্বীপের সেই প্রখ্যাত নৈয়ায়িক সার্বভৌম ভট্টাচার্য যাঁর টোলে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন নিমাই। এখন তিনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত। সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি। তিনি কিন্তু তাঁর পূর্বতন ছাত্রটিকে চিনতে পারলেন না। সেই দৃশ্য দেখে সার্বভৌমের মন হাহাকার করে উঠলো। এই নবীন সন্ন্যাসীর সুন্দর কোমল দেবদুর্লভ শরীরটিকে রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজের বুক দিয়ে তাকে আবৃত করে রাখলেন। তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে অচৈতন্য এই দেহটি বহন করে নিয়ে পৌঁছে দিল সার্বভৌমের আবাসে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল সন্ন্যাসীর জ্ঞান হলো না।

কে এই অজ্ঞাত পরিচয় সন্ন্যাসী?

এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার, মহাসমাধির সুস্পষ্ট লক্ষণ—এসব তো সাধারণ মানুষে সম্ভব নয়। সার্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ পরম পণ্ডিত। শাস্ত্রে উল্লিখিত লক্ষণগুলি মিলিয়ে তিনি প্রভুর প্রেমের গভীরতার পরিমাপ করার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ বাদেই নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডাদের মুখে শুনলেন, এক তরুণ সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শনে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন এবং তাঁকে সার্বভৌমের বাড়িতে রাখা হয়েছে। তাঁদের বুঝতে বিলম্ব হলো না সন্ন্যাসী কে! সকলে মিলে তখন তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলেন সার্বভৌম গৃহে।

প্রভুর তখনো বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে নি।

শুরু হয় নাম-সংকীর্তন।

ভুবনমঙ্গল সেই নাম শুনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'হরি হরি' বলে উঠে বসলেন।

তখন সার্বভৌম অনুরোধ করলেন, আপনি ভক্তদের নিয়ে সমুদ্রে স্নান করে এসে দয়া করে আমার বাড়িতে আজ ভিক্ষাগ্রহণ করুন। প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে স্নান করে এলে, সার্বভৌম অত্যন্ত যত্ন-ভক্তিসহকারে জগন্নাথের প্রসাদ দিয়ে ভোজন-সেবা করালেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি, আচার্য গোপীনাথ তখন সন্ন্যাসীর পরিচয় দিলেন। সার্বভৌম সকল কথা জানতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। বললেন, আপনি আমার পরমাত্মীয়। আপনি সন্ন্যাসী, সুতরাং আমার পূজ্য। আমাকে আপনার দাস বলেই অনুগ্রহ করবেন।

—কৃষ্ণে মতি হোক। আমি সন্ন্যাসী মাত্র। আর আপনি সন্ন্যাসীদের শিক্ষাগুরু। জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি। আপনি আমার গুরুস্থানীয়। আজ আপনি আমাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

—তুমি আর একলা মন্দিরে দর্শনে যেও না, আমার সঙ্গে অথবা আমার লোক সঙ্গে নিয়ে যেও।

—তাই করব। আর সম্মুখে গিয়ে দর্শন করব না, গরুড় স্তম্ভের পেছন থেকেই দর্শন করব।

সার্বভৌম তাঁর এক আত্মীয়ের নির্জন গৃহে প্রভুর থাকার ব্যবস্থা করলেন। সন্ন্যাসীর যেমন বিনীত স্বভাব, তেমনি সুন্দর দেখতে তাঁকে। দেখলেই অন্তরে প্রীতির সঞ্চার হয়। ইনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, এর সন্ন্যাসের নামই বা কি—এসব জানবার ইচ্ছা হলো সার্বভৌমের। ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করতেই গোপীনাথ আচার্য বললেন, ইনি ভারতী সম্প্রদায়ের। এঁর সন্ন্যাস নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

—সুন্দর নাম, উত্তম নাম। কিন্তু সম্প্রদায় উত্তম নয়।

—উত্তম নয়?

—না, মধ্যম।

শুনে ক্ষুব্ধ হন গোপীনাথ। প্রভু বা প্রভুর কাজ দুইই সমালোচনার অতীত। কিন্তু স্নেহের সঞ্চার হয়েছে সার্বভৌমের অন্তরে এই সন্ন্যাসীর প্রতি। তাই তিনি তাঁর ভালোমন্দের চিন্তা না করে পারলেন না। সন্ন্যাসীর ভগবত্তা তাঁর অনুভবের বাইরে। তাই বুঝি ভগ্নীপতিকে বললেন, এই অল্প বয়সে ইনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। এই বয়সে সন্ন্যাস রক্ষা করা খুব কঠিন। তবে আমি যদি বেদান্ত পড়িয়ে এঁকে অদ্বৈত-মার্গে আনতে পারি তাহলে এঁর কল্যাণ হবে।

—আর একটু বুঝিয়ে বলো।

—অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করলে এঁর নেতিনেতি বিচারবোধটা হবে, তখন যথার্থ জ্ঞানের উদয় হবে। সব মোহই দূর হবে। আর ইনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আবার যোগপট্ট দিয়ে উত্তম সম্প্রদায় থেকে এঁর সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করতে পারি।

এই কথা শুনে গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুজনেরই দুঃখ হলো। যিনি স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ, যিনি দ্বৈতাদ্বৈতের মীমাংসা, তাঁর সন্ন্যাস রক্ষা করবেন সার্বভৌম, অদ্বৈতমার্গে এনে!

—ভট্টাচার্য, ইনি স্বয়ং ভগবান, তুমি এটা বুঝতে পারোনি।

—ভগবান!

—হ্যাঁ, ইনি স্বয়ং ভগবান।

সার্বভৌমের শিষ্যরা এই কথার প্রতিবাদ করে সমস্বরে বলে ওঠেন—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে?

এইসব বিরূপ আলোচনায় বিচলিত হয়ে আচার্য গোপীনাথ তখন প্রত্যয়ের ভঙ্গীতে বলেন, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞজন যা বলেছেন—ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাই-ই প্রমাণ। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব কখনো জানা যায় না। যার প্রতি ঈশ্বরকৃপার লেশমাত্র বর্ষিত হয় নি সেই দুর্ভাগা ঈশ্বরতত্ত্ব জানবে কোথা থেকে?

ঘৃতে যেন ইন্ধন পড়লো।

—আচার্য! একটু সাবধান হয়ে কথা বলো। আমি না হয় ঈশ্বরকৃপা পাইনি কিন্তু তোমাতে যে ঈশ্বরকৃপা আছে তার প্রমাণ কি?

—দেখামাত্র সে জ্ঞান হয় তা বস্তুর জ্ঞান কিন্তু তা বস্তুর আসল জ্ঞান নয়—যেমন হীরে আর কাঁচ।

—ভালো কথা। ইনি যে মহা ভাগবত তা তো আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোনো শাস্ত্রেই কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা নেই।

—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থে এ কথা—কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে। আমি শাস্ত্রবাণী উল্লেখ করছি, শোনো। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন :

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০।৮।১৩
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১।৫।৩২

আর মহাভারত বলছেন :

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

গীতাতেও শ্রীভগবান নিজমুখে বলছেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৭-৮

এইসব শ্লোক উদ্ধৃত করে, তাঁর বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে আচার্য গোপীনাথ তখন সর্বভৌমকে বললেন :

ভট্টাচার্য তুমি ইহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতে সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥

ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পারো জানিতে ॥[১]

তর্ক-বিতর্কের পর ভট্টাচার্য তাঁর ভগ্নীপতিকে বললেন, মানলাম তোমার সব কথা। এখন তুমি চৈতন্যগোসাঞিকে আমার গৃহে তাঁর ভক্তদের নিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করবার নিমন্ত্রণ করে এসো।

মুকুন্দকে সঙ্গে নিয়ে গোপীনাথ উপস্থিত হলেন প্রভুর কাছে। ভট্টাচার্যের নামে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে, দুজনেই সার্বভৌমের ভক্তি-হীনতার কথা উল্লেখ করলেন এবং শুষ্ক জ্ঞানী বলে পণ্ডিতের নিন্দাও করলেন।

—তোমরা এভাবে ভট্টাচার্যের নিন্দা করো না। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। আমার প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহ। তাঁর দোষ দেখা তোমাদের উচিত নয়। তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

'আজ সাত দিন হলো সার্বভৌমের কাছে বেদান্ত শুনছেন গৌর সন্ন্যাসী। শুনছেন নিবিষ্টচিত্তে এবং বিনা প্রশ্নে। একাদিক্রমে সাত দিন ধরে বেদান্ত পড়িয়ে যাকে জ্ঞানের আলোকে আনবার আশায় সার্বভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, সাত দিনের মধ্যে একটি দিনও তো কই তাঁর মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

বিস্মিত হন সেই বৈদান্তিক পণ্ডিত।

বাতুল না মূর্খ, ভাবেন তিনি।

অনেককাল যাবৎ অনেক লোককে তিনি বেদান্ত পড়িয়ে আসছেন, কিন্তু এমন নীরবভাবে, একটা প্রশ্ন না তুলে, কেউ তো কখনো তাঁর কাছে বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করে নি। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।

—আমি যে তোমাকে পড়াচ্ছি সাত দিন ধরে, তুমি বুঝতে পারছ কি না, কিছুই তো বলছ না? আমি কেমন করে জানব তুমি বুঝছ?

—আপনি শুনতে বলেছেন, তাই শুধু শুনছি।

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

—সূত্র ও ব্যাখ্যা দুই-ই শুনছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা আমি কিছুই বুঝি না।

—কি বললে ? আমার ব্যাখ্যা বুঝতে পারছ না ?

তখন নবীন সন্ন্যাসী বললেন :

সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥[১]

তারপর তিনি একে একে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র মথিত করে, স্থাপিত করলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব—ভারতের অধ্যাত্ম জগতে যা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশিষ্ট দান। ভক্তির জয় হলো। তথাপি পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্বভৌম কিছুতেই নত হতে চাইলেন না। অবশেষে নিজের হৃত-গৌরব উদ্ধারের আশায় ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করলেন :

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ ১।৭।১০

এবং এর নয় রকম অর্থ করলেন। মহাপ্রভু মন দিয়ে শুনলেন। তারপর ঈষৎ হেসে বললেন :

ভট্টাচার্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে নাহি কারো শক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বৈ শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥[২]

—কী, তোমার এত বড়ো দম্ভ ! আমি ন' রকম ব্যাখ্যা করলাম, আর তুমি বলছ শ্লোকের অন্য অর্থ আছে। বেশ, ব্যাখ্যা করো।

তখন সার্বভৌমের অনুরোধে মহাপ্রভু অর্থ করতে লাগলেন।

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শুধু শ্লোকের নয়, প্রতিটি শব্দের।

কত প্রকার যে অর্থ করলেন তার আর ইয়ত্তা রইল না।

তখন ভারত-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তম্ভিত মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে পড়লেন। ধুলায় লুটাল তাঁর শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার। এইভাবে সেদিন প্রভু আত্মারাম শ্লোকটির নতুন আঠারো রকম ব্যাখ্যা করে তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছিলেন।' তখন আত্মনিন্দা করে সার্বভৌম শরণ নিলেন সেই তরুণ সন্ন্যাসীর যাঁর বয়স সবে মাত্র পঁচিশ বছর। প্রভু তাঁকে কৃপা করলেন, দেখালেন তাঁর ষড়ভুজ মূর্তি। অমনি অচৈতন্য হলেন সার্বভৌম। যখন চেতনা পেয়ে উঠলেন, তখন অশ্রুভরা চক্ষে যুক্ত করে দাঁড়ালেন ভক্ত। একচুক্ষণে বাদে দুটি শ্লোক লিখে উৎসর্গ করলেন প্রভুর চরণে.

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

অর্থাৎ, যে করুণাবারিধি অদ্বিতীয় পুরাণপুরুষ বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং নিজস্ব ভক্তিযোগ নিজে আচরণ করে অন্যকে শিখাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর শরণ নিলাম। কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় স্বকীয় অসাধারণ ভক্তিযোগ প্রচার করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক।'

তারপর সার্বভৌম-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় মহাপ্রভুর মহিম্নস্তুতি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম-ত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদিলোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধ সত্ত্ব রূপন্যাসিবর॥
কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্বার নিজভক্তি প্রকাশ কারণে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥
বৈরাগ্য-সহিতে নিজভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু পুরুষ-প্রমাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥[১]

এইভাবে সেদিন সার্বভৌম এক শত শ্লোকে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করে স্তব করলেন নিভৃতে নিজের ভবনে। এই শ্লোক শতকের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে গৌরহরির নীলাচল-লীলার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়—সার্বভৌম-উদ্ধার।

॥ তেরো ॥

গৃহত্যাগের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হলো।

মাঘ শুক্লপক্ষে নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ফাল্গুনে এসে নীলাচলে বাস করেন।

চৈত্র পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে সার্বভৌমকে উদ্ধার করেন।

এইবার 'দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।' বৈশাখের প্রথমেই তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাবেন ঠিক করলেন। একাকীই যাবেন, সঙ্গে কাউকে নেবে না। এই কথা শুনে ভক্তদের মনে মহা দুঃখ হলো। তাঁদের মাথায় যেন বজ্র পড়লো। সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

—তুমি একলা যাবে, তা কি কখনো হয়? বলেন নিত্যানন্দ।

—হ্যাঁ, একাই যাব। বিশ্বরূপের অনুসন্ধানেই আমার এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ।

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

—আমরা তা সহ্য করব কি করে? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার সব জানা। আমি তোমার সঙ্গী হব। আজ্ঞা দাও।

—সেবার সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাব ঠিক করলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে নিয়ে গিয়েছিলে। নীলাচল আসার সময় পথে আমার দণ্ড ভাঙলে। তোমাদের প্রবল স্নেহে আমার সব কাজ ভণ্ডুল হয়। তোমরা সবাই নীলাচলে অবস্থান, কর, আমি দিন কতক একাকী তীর্থ ভ্রমণ করব।

সকলেই জানেন প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

তাঁর কথার উপর কারো অনুরোধ-উপরোধ নিষ্ফল।

'একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া'—এই ছিল প্রভুর মনোগত অভিলাষ। শেষে মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি চারজন ভক্ত সঙ্গী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু কোন ফল হলো না—'স্বতন্ত্র ঈশ্বর কভু না মানিল।' তখন নিত্যানন্দ বলেন, তোমার কথাই আমরা মেনে নেব। সুখ হোক দুঃখ হোক, তোমার যা অভিলাষ তাই আমাদের কর্তব্য।

তারপর একটু নীরব থেকে তিনি বলেন :

কিন্তু এক নিবেদন করোঁ। আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥[১]

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের এই অনুরোধ অঙ্গীকার করলেন। নীলাচল ত্যাগের পূর্বে নিত্যানন্দ সকলকে নিয়ে একদিন এলেন সার্বভৌমের ভবনে। সবাইকে নমস্কার করে বসবার জন্য আসন নিবেদন করলেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিছুক্ষণ কৃষ্ণপ্রসঙ্গের পর গৌরহরি বললেন :

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥

তখন সার্বভৌম চারখানি কৌপীন বহির্বাস আর জগন্নাথের প্রসাদী মালা ও প্রসাদান্ন প্রভুর হাতে প্রদান করে বললেন : গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ আছেন। বিদ্যানগরের অধিকারী তিনি। শূদ্রবিষয়ী জ্ঞানে তাঁকে উপেক্ষা করবে না। তাঁর সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করবে। কারণ—

তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দু'হের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥[১]

প্রভু সার্বভৌমের কথা অঙ্গীকার করলেন এবং বিদায়ের কালে আলিঙ্গন প্রদান করে পণ্ডিতকে কৃতার্থ করলেন। বিদায়বেলায় শুধু বললেন :

ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রাসাদে॥[২]

গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর।

দক্ষিণ ভ্রমণের পথে প্রভু সার্বভৌমের নির্দেশ মতো এখানে এসে মিলিত হলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে। সেদিন রস ও রসিকের, আস্বাদ্য আস্বাদনের সে মিলনের ছবি কল্পনা করলে আজো শরীরে রোমাঞ্চ

১, ২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জাগে। যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, যে অনাস্বাদিতপূর্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপ্রতিনিধি রামানন্দ গোপনে এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতেন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলতো রসাস্বাদন।

গোদাবরী দেখে হলো যমুনা-স্মরণ ; তার তীরে বন দেখে বৃন্দাবন-স্মৃতি জেগে ওঠে। কিছুক্ষণ সেখানে নৃত্য গান করলেন। তারপর গোদাবরী পার হলেন ; সেখানে স্নান করলেন গৌরসন্ন্যাসী। স্নান শেষ করে শুরু করেন নাম সংকীর্তন :

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্ ।
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহি মাম্ ।

এই শ্লোক পড়তে পড়তে নীলাচল ত্যাগের পর, এতটা পথ তিনি অতিক্রম করে চলে এসেছেন। পথে কাউকে দেখলেই বলতেন হরি হরি। যাকে দেখেন তাকেই বলেন—কহ কৃষ্ণনাম। যে শক্তি তিনি নদীয়ায় প্রকাশ করেন নি, সেই প্রকাশ করে তিনি সমগ্র দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করেছিলেন।

তারপর বিদ্যানগরে এসে মিলিত হলেন রামানন্দের সঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের এই মিলন তাঁর ঐতিহাসিক দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকে বিশেষভাবেই চিহ্নিত করেছে। সমগ্র গৌরলীলাকে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করেছে এই অপূর্ব মিলন। প্রথম দর্শনেই প্রভু সম্ভাষণ করলেন রাজপ্রতিনিধি রায়কে এই বলে :

তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হইল অনায়াসে পাইল দরশন ॥[১]

চতুর্দোলায় চড়ে, লোকজন সঙ্গে নিয়ে, কত বাজনা বাজিয়ে রাজমন্ত্রী

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এলেন স্নান করতে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে। সঙ্গে কত বৈদিক ব্রাহ্মণ। তিনি জাতিতে শূদ্র। তাঁকে দেখেই প্রভু বুঝলেন সার্বভৌম-কথিত এই সেই রাম রায়। তবু তিনি ধৈর্য ধরে বসে রইলেন।

অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখে রামানন্দ তাঁর কাছে এলেন।

শত সূর্যের সমান তাঁর দেহ কান্তি।

পরনে সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস। কমল নেত্র। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ।

রামানন্দ দেখে চমৎকৃত হলেন। দণ্ডবৎ নমস্কার করলেন।

—তুমি রায় রামানন্দ?

—আমি সেই মন্দ শূদ্র। আপনার দাস।

আলিঙ্গন—দৃঢ় আলিঙ্গনে প্রভু বাঁধলেন তাঁকে। তারপর দুজনেই প্রেমাবেশে অচৈতন্য হলেন। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে মাটিতে পড়ে গেলেন। দুজনের মুখে গদ্‌গদ কৃষ্ণনাম আর তাঁদের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে স্তম্ভ, স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক অশ্রু আর বৈবর্ণ্য। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বৈদিক ব্রাহ্মণদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

দিনের সূর্য অস্ত গেল গোদাবরীর স্বচ্ছ সলিলে। প্রভু সান্ধ্য স্নান শেষ করে বসে আছেন উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে। এমন সময়ে একটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করে এলেন রামানন্দ। একজন করেন দণ্ডবৎ প্রণাম, অন্যজন দেন আলিঙ্গন। শুরু হয় দুজনের মধ্যে অপূর্ব রসতত্ত্বের আলোচনা। একজনের মুখে শুধু প্রশ্ন, অন্যজন দিতে থাকেন উত্তর। প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গভীর রাত হয়ে যায়। আলোচনা তবু শেষ হয় না।

শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আমার চিত্তে এক সংশয় দেখা দিয়েছে।

—কিসের সংশয়? সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্পর্কে?

—না। তোমারই সম্বন্ধে, তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি:

পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥

তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ-ঢাকা॥[১]

গৌর সন্ন্যাসী তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলেন, রায়, তুমি কৃষ্ণপ্রেমিক, তুমি কৃষ্ণভক্ত; আর ভক্তের লক্ষণই এই, সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন হয়।

রায় কহে—তুমি প্রভু! ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥[২]

প্রভু ধরা পড়েছেন এবং যাঁর কাছে ধরা পড়েছেন তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ রসিকশেখর, সাড়ে তিনজন পাত্রের মধ্যে একজন। তাই, হেসে হেসে রামানন্দকে দেখালেন তাঁর স্বরূপ। কী সেই স্বরূপ? না—'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।'

সে অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শন করে রায় আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেইদিন গোদাবরীতীরে জগতে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, মহারাসতত্ত্ব প্রকটিত হলো এবং সেই তত্ত্ব প্রথম আস্বাদন করলেন রায় রামানন্দ। এইভাবে দশ রাত্রি চলেছিল রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই নিগূঢ় আলোচনা। বিদায়ের কালে বলে এলেন :

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

দশ দিন রায়ের সঙ্গে অতিবাহিত করে, প্রভু যাত্রা করলেন দাক্ষিণাত্যের পথে। তখন দুজনের মধ্যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, সেই বিষয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

॥ চৌদ্দ ॥

বন্ধুর দুর্গম পথে চলেছেন নবীন সন্ন্যাসী।

চলেছেন তিনি দিগ্‌দিগন্ত পুণ্যস্নিগ্ধ করে।

তাঁর কণ্ঠে অবিরাম শুধু কৃষ্ণনাম।

যে একবার দেখেছে পতিতপাবন গৌরকে, সেই-ই মুগ্ধ হয়েছে। যার কানে একবার প্রবেশ করেছে তাঁর শ্রীমুখের উচ্চারিত ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনাম, সেই ই আকুল কণ্ঠে বলে—'হরি হরি। হরে কৃষ্ণ'! শুধু বলা নয়, তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে সব কিছু ভুলে। সংসারের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা ভুলে যায় তারা, যেন জীবনের চরম পাওয়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আর কিছু চাওয়ার নেই।

গৌরহরি একবার যাকে স্পর্শ করছেন, সেই যেন তক্ষণি পূর্ণ হয়ে যায় নামের শক্তিতে আর অপার্থিব আনন্দে অভিসিঞ্চিত হয় তার দেহ মন প্রাণ। এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। স্পর্শিত ব্যক্তি যখন অন্যজনকে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তিও পূর্ণ হয়ে ওঠে এক দিব্য শক্তিতে। একের স্পর্শে অপরে, এইভাবে মুহূর্তে রূপান্তর ঘটছে সর্ব মানবচিত্তের। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দিক্ থেকে দিগন্তরে ব্যাপ্ত হয় ভুবনমঙ্গল নাম—আকাশ, বাতাস ভরে ওঠে কৃষ্ণনামের মাধুর্যে।

চলতে চলতে উপনীত হন কূর্মস্থানে।

এখানে উদ্ধার করলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক বিপ্রকে। শুষ্ক জ্ঞানী, তার্কিক, ধর্মহীন পাষণ্ডী লোকে পূর্ণ ছিল দক্ষিণ দেশ; কিছু ভক্ত ও মরমী সিদ্ধ-সাধক যে না ছিলেন তা নয়। প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শে সবাই ভক্তির পথ ধরে বৈষ্ণব হতে থাকে। যে উদ্দেশ্যে এদেশে তাঁর আগমন, তা সিদ্ধ হলো। আবার মাঝে মাঝে তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এক বৌদ্ধ আচার্য প্রভুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি প্রভুকে অপমান করার জন্য অমেধ্য, অশুচি, অন্নপূর্ণ এক থালি এনে বিষ্ণুর প্রসাদ বলে প্রভুকে

দিলেন। 'প্রসাদ'-এর অমর্যাদা তিনি কখনো করেন না। তিনি গ্রহণ করে দুহাতে তা ঊর্ধ্বে তুলে চলতে লাগলেন। এমন সময় কোথা থেকে এক মহাকায় পাখি এসে ঠোঁট করে থালাখানি নিয়ে শূন্যপথে উড়তে থাকে। অকস্মাৎ সেটি বৌদ্ধাচার্যের মাথায় পড়ে তিনি অচৈতন্য হয়ে রইলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর চরণে পড়লে তিনি নামামৃতপ্রসাদ দানে আচার্যকে সুস্থ করে দিয়ে আপন গন্তব্যপথে চলে গেলেন।

ত্রিমল্ল, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করতে করতে চলেছেন সন্ন্যাসী। যেখানে যত বিগ্রহ দেখেন তাদের বন্দনা অর্চনা করেন — তা সে বিগ্রহ শিব বা শক্তি বিগ্রহ হোক না কেন। যিনি ঈশ্বর, যিনি ধর্মসংস্থাপক তাঁর যে কোনো ভেদ নেই। যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব, তিনিই যে শক্তি ও শক্তিমান তাই-ই দেখালেন প্রভু এইভাবে প্রতি তীর্থে, প্রতি বিগ্রহের অর্চনা করে।

অবশেষে উপনীত হলেন শ্রীরঙ্গনাথে।

দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীরঙ্গনাথ।

দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম এই তীর্থে। প্রভুর বাসনা হলো এখানে কিছুকাল অবস্থান করবেন। বিগ্রহ দর্শনমাত্রে আরম্ভ হয় তাঁর অদ্ভুত অলৌকিক প্রেমের প্রকাশ। এইখানে বেঙ্কটভট্ট নামে এক বৈষ্ণব ভক্তের আগ্রহে ও ব্যাকুলতায় তাঁর গৃহে চারমাস বাস করে চাতুর্মাস্য ব্রত উদযাপন করতে স্বীকৃত হলেন। কৃষ্ণকথারসে চার মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল প্রভু এবং ভট্ট কেউই তা বুঝতে পারলেন না।

মহাপ্রভু লক্ষ্য করলেন প্রত্যহ এক দীনহীন ব্রাহ্মণ শ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দিরের এক নিভৃত কোণে বসে গীতাপাঠ করেন। প্রতিদিন এইভাবে সমস্ত গীতাখানা পাঠ করেন। পাঠ করেন আনন্দ আবেশে। কিন্তু শ্রোতারা করে উপহাস। কারণ ব্রাহ্মণের উচ্চারণ অশুদ্ধ। কেউ হাসে, টিক বা নিন্দা করে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদিন। ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ শেষ হয়েছে।

প্রভু প্রত্যহ লক্ষ্য করছেন—উচ্চারণ অশুদ্ধ, কিন্তু কি বিশুদ্ধ আনন্দে ব্রাহ্মণের হৃদয়টি পূর্ণ আর তারই উজ্জ্বল অভিব্যক্তি তাঁর মুখে, তাঁর চোখে। যতক্ষণ পড়েন ততক্ষণ ব্রাহ্মণের শরীরে দেখা যায় পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। সেদিন প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ! গীতার কি অর্থ জেনে আপনার এত আনন্দ হয়, তা আমাকে কৃপা করে বলবেন কি?

—আমি মূর্খ, শব্দার্থ জানি না, শুধু গুরুর আদেশে পড়ি। পাঠ শুদ্ধ হয় কি অশুদ্ধ, তা খেয়াল করি না। কিন্তু—

—কিন্তু কি ব্রাহ্মণ?

—যতক্ষণ পাঠ করি আমি দেখতে পাই অর্জুনের রথে সারথি হয়ে কৃষ্ণ রজ্জু ও চাবুক ধরে বসে আছেন। দিচ্ছেন হিত উপদেশ। এই দেখে আমার সমস্ত শরীর আনন্দ আবেশে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

—যতক্ষণ পাঠ করেন ততক্ষণ কি এই দর্শন হয়?

—হ্যাঁ প্রভু! যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণই এই নয়নাভিরামের দর্শন পাই। তাই পাঠ ছাড়তে মন চায় না।

—ব্রাহ্মণ! তুমি মূর্খ নও, তুমি দ্বিজোত্তম, গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।

পরমানন্দে সেই বিপ্রকে আলিঙ্গন দিলেন প্রভু।

পুলকে পরিপ্লুত ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়েন তাঁর চরণে। বলেন:

তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥[১]

মহাপ্রভু আত্মগোপন করলেন না। সরল সৌভাগ্যবান বিপ্রকে দেখালেন তাঁর স্বরূপ। চার মাস রইলেন ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে—সেই সময় কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা, কত ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় কথা শুনে কৃতার্থ হন তিনি। চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলো। এবার যাত্রার পালা। বিচ্ছেদকাতর ভট্টকে শ্রীরঙ্গনাথে রেখে, সন্ন্যাসী চললেন আরো দক্ষিণে।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশৈল।

দক্ষিণের আর একটি পুণ্যতীর্থ।

এখানে এসে প্রভু এক ব্রাহ্মণ দম্পতির দেখা পেলেন। তাঁদের নিমন্ত্রণে তিনদিন রইলেন সেখানে। নিভৃতে বসে কি আলাপ করলেন তাঁদের সঙ্গে কে জানে? তিনদিন পরে তাঁদের অনুমতি নিয়ে প্রভু চললেন দক্ষিণে। সঙ্গী কৃষ্ণদাস বা অপর কেউই জানল না ব্রাহ্মণ দম্পতির ছদ্মবেশে যাঁরা প্রভুকে বিদায় দিলেন তাঁরা আর কেউ নন—স্বয়ং হরপার্বতী।

কামকোষ্ঠী হয়ে প্রভু এলেন দক্ষিণ মথুরায়।

সেখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা।

তিনি স্বগৃহে মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ করেন প্রভুকে।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়, অথচ আহারের কোনো আয়োজন নেই দেখে বিস্মিত প্রভু ব্রাহ্মণকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

—প্রভু আমি অরণ্যবাসী। এখানে কিছুই মেলে না। লক্ষণ বন থেকে ফলমূল আনবেন তবে তো সীতাদেবী রাঁধবেন?

বিপ্রের ইষ্টতন্ময়তা মহাপ্রভুকে বিস্মিত করলো। তিনি প্রীত হলেন। বহুক্ষণ পরে, যেন ক্ষণিকের জন্য আবেশমুক্ত হয়ে, সামান্য আয়োজন করে বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করালেন, কিন্তু নিজে রইলেন উপবাসী।

—আপনি কেন উপবাস করছেন?

বিপ্র উত্তর দিলেন :

—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নিজলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥[১]

এই কথা। তবে শুনুন বলি :

ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ-মূর্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

স্পর্শিবার কার্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥[১]

প্রভুর কথায় ব্রাহ্মণ আশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করলেন।

গৌরসন্ন্যাসী চলেছেন সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের পথে।

চলেছেন তিনি কণ্ঠে অবিরাম কৃষ্ণনাম নিয়ে।

পদযাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতের এক প্রান্তে, এখন তিনি এসে পৌঁছলেন অপর প্রান্তে। কলিহত জীবের দুঃখে হৃদয় তাঁর কাঁদছিল। তাই তো তিনি দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিতরণ করলেন নাম প্রেম। দুর্গম দূর তীর্থপথ অতিক্রমণে শ্রান্ত না হলেও ম্লান হয়েছে তনুখানি।

পৌঁছলেন রামেশ্বরে।

এখানে একদিন বিপ্রসভায় পুরাণ পাঠ শুনলেন।

সহসা তাঁর কানে এলো—রাবণ যাঁকে হরণ করেছিলেন তিনি প্রকৃত সীতা নন। রাবণ আসা মাত্রই সীতা স্মরণ করেন অগ্নিদেবকে। তখন অগ্নি অ-প্রাকৃতা সীতাকে নিয়ে এক মায়া সীতাকে রেখে যায়, রাবণ তাঁকেই হরণ করেন।

এই উপাখ্যান শুনেই প্রভু হৃষ্টচিত্তে পুঁথি থেকে ঐ পৃষ্ঠাটি নিলেন। এর এক প্রতিলিপি করলেন এবং সেটি পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করে, দক্ষিণ-মথুরাবাসী সেই রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাসের জন্য পুঁথির আসল পৃষ্ঠাটি নিয়ে আবার ফিরে এলেন দক্ষিণ মথুরায়। পুঁথি দেখে বিপ্রের সব সংশয় দূরীভূত হয়। তিনি প্রভুর চরণ দুটি বুকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে কর ভিক্ষা অঙ্গীকার ॥[১]

বিপ্রের বাসনা পূর্ণ করে পরের দিন প্রভু আবার যাত্রা করলেন পথে। কন্যাকুমারী দর্শন করে এলেন মল্লার তীর্থে। এইখানে ভট্টমারী নামে একদল ভ্রষ্ট বামাচারী সন্ন্যাসী থাকতেন। 'স্ত্রীধন' দেখিয়ে তাঁরা প্রলুব্ধ করলেন প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে। তিনি প্রভুর অজ্ঞাতসারেই এক রাতে তাদের দলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু বিশ্বের পরিত্রাতার সেবক কোথায় যাবেন তাঁর প্রভুর কাছ থেকে?

প্রভু সেবককে খুঁজে বের করলেন।

ভট্টসারীদের কাছে এসে বললেন—আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে কে? উল্টে তারা অস্ত্র নিয়ে প্রভুকে আক্রমণ করলেন? কিন্তু নিজেদের অস্ত্র যখন নিজেদের মাথায় পড়তে লাগল তখন সেই সুযোগে চুলের মুঠি ধরে তাঁর সেবককে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

মল্লার দেশ থেকে এলেন পয়স্বিনী-তীরে।

এখানে আদিকেশব দর্শন করে প্রেমে মগ্ন হলেন।

বিগ্রহের সামনে করলেন অনেক নতিস্তুতি ও নৃত্যগীত।

বহু বৈষ্ণব বাস করতেন এখানে। এই দিব্যপুরুষের অলৌকিক প্রেমভাব তাঁদের মুগ্ধ করলো—তাঁরা রীতিমত বিস্মিত হলেন। আদিকেশব তীর্থে প্রভুর একটি পরম বস্তু লাভ হয়। সেটি হলো বৈষ্ণবের পরমপ্রিয় 'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়' গ্রন্থ।

পুঁথি পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ ॥

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥[১]

দুর্লভ এই গ্রন্থটি পেয়ে প্রভুর আনন্দের যেন সীমা রইল না। তিনি সযত্নে সেটি নকল করিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

এলেন শৃঙ্গেরী মঠ।

শঙ্করাচার্যের স্মৃতিপূত শৃঙ্গেরী মঠ।

সেখান থেকে মৎস্যতীর্থে এসে স্নান করলেন তুঙ্গভদ্রায়।

তারপর এলেন মধ্বাচার্য-প্রতিষ্ঠিত নর্তক গোপালের স্থানে।

কিন্তু অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী মনে করে গোপালের সেবকগণ প্রভুকে কোনরকম সম্ভাষণই করল না। কিন্তু পরে প্রভুর অলৌকিক প্রেম দর্শনে তাঁরা মুগ্ধ হলেন এবং 'বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার।' মধ্বাচার্যের শিষ্যরা তত্ত্ববাদী এবং দ্বৈতবাদী। তথাপি তাঁরা সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্যাদি পাঁচরকম মুক্তিকেই শ্রেষ্ঠসাধন বলে স্বীকার করেন এবং কর্মকেই সাধনা বলে তাঁরা জানেন। তত্ত্ববাদী প্রবীণ আচার্যের কাছে সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানতে চেয়ে মহাপ্রভু তাঁদের কাছে এই মতই শুনলেন।

তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্রভঙ্গিতে প্রভু বললেন, কিন্তু শ্রীপাদ্। ভাগবত বলেছেন :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তসম॥ ৭।৫।২৩, ২৪

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি নয় রকম ভক্তিই সাধন, কর্ম নয়। আর এই সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকার পাওয়াই হলো সাধ্য। মুক্তি নয়। আপনি ভক্ত হয়ে কি জানেন না যে, একমাত্র কৃষ্ণসেবা ভিন্ন ভক্তের কাম্য কিছুই থাকতে পারে না? ভগবান নিজে দিতে চাইলেও ভক্ত মুক্তি গ্রহণ করে না।

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই পর্যন্ত বলে প্রভু নীরব হলেন।

তখন লজ্জিত হয়ে আচার্য বলেন, প্রভু! তুমি যা বলছ তা সত্যই, কিন্তু সম্প্রদায়ের খাতিরে আমাদের মানতে হয় পূর্বসিদ্ধান্ত।

—যাই হোক, আপনাদের মধ্যে একটা ভাল জিনিস লক্ষ্য করছি, যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে মায়িক বলে উপেক্ষা না করে আপনারা চিন্ময়রূপে সেবা করেন।

সেখান থেকে একে একে ক্ষীরভগবতী, গোকর্ণাশব প্রভৃতি দর্শন করে করে গৌরসন্ন্যাসী এলেন বিটঠলদেব দর্শনে। যথারীতি বিগ্রহ দর্শনে 'প্রেমাবেশে কৈল প্রভু নর্তন কীর্তন।' শুনলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী এখানে আছেন। প্রভু সাক্ষাৎ করলেন তার সঙ্গে, দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন তাঁকে। গুরু সম্বন্ধ স্মরণ মাত্রই প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে, নয়নে ঝরে প্রেমাশ্রু।

—তুমি কে?

—আমি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

—আমার পরম প্রেমময় গুরু মাধবেন্দ্রজী?

—হ্যা।

—ঠিক তো। নতুবা এই অলৌকিক প্রেম তুমি কোথা লাভ করলে। মাধবেন্দ্রজী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কারো তো এমন প্রেম নেই।

প্রভুর পরিচয় পেয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয় শ্রীরঙ্গপুরীর অন্তর। নিবিড় আলিঙ্গনে প্রভুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

—দেশ কোথায়?

—নবদ্বীপ।

—নবদ্বীপ! একবার গুরুর সঙ্গে সেই দেশে গিয়ে ভিক্ষা করেছিলাম এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে। নাম তাঁর জগন্নাথ মিশ্র। তাঁর পত্নী শচীদেবী পরম ভক্তিমতী। বিশ্বরূপ নামে তাঁদের একটি পরম সুন্দর পুত্র ছিল। শচীদেবীর হাতের রান্নাই বা কি সুন্দর।

—বিশ্বরূপের কথা আর কিছু জানেন?

—জানি বৈ কি। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, পরে সিদ্ধিলাভ করেন। এই তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম ছিল শ্রীশঙ্করারণ্য।

অগ্রজের সঠিক সংবাদ জেনে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ তাঁর সার্থক হলো মনে করলেন প্রভু। তখন পুরীজীর কাছে তিনি নিজের পরিচয় জানালেন। তাঁর আনন্দ দ্বিগুণিত হয়। অতঃপর পুরীজীর অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু উপনীত হলেন কৃষ্ণবেণ্ণ তীরে। সেখানে মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। বৈষ্ণব ভক্তদের শ্রবণমঙ্গল এই গ্রন্থ, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনী। বৈষ্ণব জগতে এই গ্রন্থখানি মাধুর্যের সার বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

গ্রন্থখানি পেয়ে প্রভুর সে কী আনন্দ। আনন্দে তিনি নৃত্য করতে থাকেন।

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুয কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥[১]

তারপর একে একে ঋষ্যমূক পর্বত, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ করে, সপ্ততাল বিমোচন করে ক্রমে নাসিক, ত্র্যম্বক, পঞ্চবটী পরিক্রমা করে মহাপ্রভু আবার এলেন গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে। এলেন তিনি রায় রামানন্দের কাছে। আপন অন্তরতমকে পেয়ে রায়ের অন্তরও ভরে ওঠে সুধারসে!

—আমার সংগৃহীত এই রত্ন দুটি নাও।

—'কৃষ্ণকর্ণামৃত'! 'ব্রহ্মসংহিতা'!—দুটি গ্রন্থই দুর্লভ রত্ন।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত।

—রায়, কৃষ্ণমাধুর্যের যে বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় তত্ত্বের যে ইঙ্গিত দিয়ে তুমি আমাকে অমৃতরসে সিক্ত করেছিলে, সেইসব রস, সব সিদ্ধান্তই এই দুই গ্রন্থে আছে।

রামানন্দ সাগ্রহে গ্রন্থ দুখানি মাথায় তুলে নিলেন। ক্রমে নীলাচলে, গৌড়ে, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজে এই দুই গ্রন্থের বিস্তার হতে থাকে। পাঁচ সাত দিন পরম আনন্দে কেটে গেল। প্রভুর মন এখন নীলাচল-মুখী। গৌড় ও নীলাচলের ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অধীর হলেন—অন্তরে উপলব্ধি করলেন তাঁদের বিচ্ছেদ-তাপ। রায়কে তাড়াতাড়ি নীলাচলে চলে আসবার অনুরোধ করে, তিনি অগ্রসর হলেন নীলাচলের পথে।

॥ পনেরো ॥

দীর্ঘ দু'বছরের পদযাত্রা শেষ হলো।

মহাপ্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে।

আলালনাথে এসে তিনি কৃষ্ণদাসকে পাঠালেন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তদের কাছে। দ্রুত অধীর চরণে সবাই ছুটে চলেন সেখানে প্রভু দর্শনের আশায়। পথেই মিলন হয়। ধীরে সবাইকে নিয়ে তিনি এলেন প্রাণনাথ জগন্নাথের দ্বারে। দ্বার অতিক্রম করে এলেন ভিতরে যেখানে বেদীর উপর রয়েছেন ত্রিমূর্তি—সুভদ্রা-জগন্নাথ-বলরাম। প্রভুর দৃষ্টি জগন্নাথের মুখের দিকে, আর ভক্তদের তৃষিত দৃষ্টি তাঁদের প্রিয়তম প্রভুর দিকে।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর অনেক দিনের অভিলাষ মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন, এবং কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর কৌতূহলের আরো একটি নিগূঢ় কারণ ছিল। গৌড়দেশের যে সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে তাঁর সভাপণ্ডিত, কঠোর অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে,

না জানি তিনি কেমন। এজন্য সভাপণ্ডিতকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে সার্বভৌম রাজাকে বলেছিলেন :

বিরক্ত সন্ন্যাসী তিহোঁ রহয়ে নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিহেঁা রাজ-দরশনে॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিহেঁা দক্ষিণে গমন॥[১]

প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জগন্নাথ ছেড়ে তিনি কেন গেলেন?

মহান্তের এই লীলা। তীর্থ পবিত্র করার জন্যই তিনি তীর্থভ্রমণ করেন আর সেই সঙ্গে সাংসারিক লোকদেরও উদ্ধার করেন।

—তাঁকে আপনি যেতে দিলেন কেন? পায়ে ধরে যত্ন করে এখানে রাখলেন না কেন?

তখন প্রতাপরুদ্র তাঁর সভাপণ্ডিতের মুখে এই উত্তর শুনেছিলেন :

তিহোঁ ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিহোঁ নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥[২]

সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, প্রভু তীর্থভ্রমণ করে ফিরেছেন, এইবার তাঁর সঙ্গে যাতে দর্শন হয়, সেই চেষ্টা করবেন। মহাপ্রভু নীলাচলে আসার পর একদিন তাঁর কাছে রাজার অনুকূলে অনুরোধ করা হলো। অনুরোধ করলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ, সার্বভৌম ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। মহাপ্রভু স্বীকৃত হলেন না। এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাবার ভয় দেখালেন।

শুনে প্রতাপরুদ্র কেঁদে উঠলেন।

দর্শন বিনা প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন।

ইতিমধ্যে রায় রামানন্দ নীলাচলে এসে গেছেন।

রাজা তাঁর অভিলাষ এবং অভিলাষ পূর্ণ না হলে প্রাণত্যাগ করার

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সংকল্পের কথা রামানন্দের গোচরে আনলেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রায় মধ্যস্থতা করতে স্বীকৃত হলেন এবং আশ্বাস দিলেন রাজাকে।

দেখতে দেখতে রথযাত্রা এসে গেল।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ এসেছেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতিকে পুরোভাগে রেখে গঠিত হয় সাতটি সংকীর্তনের দল। পুরীর রাজপথে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে পুরোভাগে রেখে, রথে চলেছেন অচল নীল দারু জগন্নাথ। মৃদঙ্গ এবং করতাল সহযোগে শুরু হয়েছে উদ্দাম কীর্তন—সে কীর্তনধ্বনিতে পুরীর আকাশ-বাতাস মুখরিত। সাতটি দলের কীর্তন চলেছে একসঙ্গে আর সাতটি দলেই ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছেন গৌরহরি। চোখের জলে বুক ভিজে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীঅঙ্গে ফুটে উঠেছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার—স্বেদ, কম্প, পুলক প্রভৃতি। ক্ষণে ক্ষণে হারাচ্ছেন বাহ্য জ্ঞান। তবুও সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন :

সেই তো পরাণনাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ।

দূর থেকে তৃষিত নয়নে চেয়ে আছেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র। সার্বভৌম একটি উপায় ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি রাজাকে বলে দিয়েছিলেন রথের আগে নৃত্য করতে করতে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু যখন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করবেন সেই সুযোগটা নিতে হবে। কি ভাবে? না রাজবেশ পরিত্যাগ করে মহারাজকে যেখানে বসে একমনে ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে রাসপঞ্চাধ্যায়ী[১] পাঠ করতে হবে। প্রভুর মন সহজেই আকৃষ্ট হবে সেই পাঠ শুনে। তখন রাজা যেন একাকী গিয়ে মহাপ্রভুর চরণ ধরেন। কৃষ্ণনাম শ্রবণে তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সেই আবিষ্ট অবস্থায় তিনি আপনাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে আলিঙ্গন করবেন। এ ছাড়া, স্বয়ং রামানন্দ প্রভুর মন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজার অনুকূলে।

১ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ এই পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। তাই এই অধ্যায় পাঁচটি রাসপঞ্চাধ্যায়ী নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

মধ্যাহ্নকাল। নৃত্যক্লান্ত প্রভু প্রবেশ করলেন সেই পুষ্পোদ্যানে ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য। রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব বেশে কম্পিত পদক্ষেপে এলেন সেখানে। প্রভুর দুই চোখ বন্ধ, ভূমিতলে অর্ধশয়ান করে আছেন। রাজা ধীরে ধীরে শ্রীচরণে মাথা রাখলেন, দুই নয়নে পড়তে থাকে অশ্রুধারা। আবৃত্তি করতে লাগলেন ভাগবতের শ্লোক। শুনে আনন্দোৎফুল্ল মুখে প্রভু বলতে লাগলেন, বলো! বলো!

শেষে প্রতাপরুদ্র পাঠ করলেন এই শ্লোকটি :

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবি ভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদ'ততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥[১]

চোখ বুজেই রাজাকে আলিঙ্গন করে প্রভু বলেন, কে তুমি? কৃষ্ণলীলামৃত পান করালে আমায়?

—আমি তোমার দাসের দাস, প্রভু।

প্রভু যেন না চিনেই প্রতাপরুদ্রকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করলেন। রাজা কৃতকৃতার্থ হয়ে পুষ্পোদ্যান থেকে বের হয়ে এলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে রামানন্দের সঙ্গে মিলন একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই ঐতিহাসিক মিলন বৈষ্ণবসমাজে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ তত্ত্বের আলোচনার জন্য। অতি নিগূঢ় সাধ্য-সাধন তত্ত্ব পৃথিবীতে সেই প্রথম বিদ্যানগরে গোদাবরী তীরে আলোচিত হয়েছিল। আজো যেন আমরা কল্পনার চক্ষে দেখি—দক্ষিণ ভারতে তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিদ্যানগরে এসে উপস্থিত হলেন এক তরুণ গৌরকান্তি অপরূপ সন্ন্যাসী। হাতে জপমালা, কণ্ঠে কৃষ্ণনাম, তাঁর কমলনয়ন দুটি যেন কার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত।

উড়িষ্যারাজের অধীন বিদ্যানগরের শাসনকর্তা রায় রামানন্দ মধ্যাহ্ন স্নানের জন্য গোদাবরী তীরে এসেছেন। দোলায় চড়ে, ভাট পুরোহিত নিয়ে রায় উপনীত হলেন, তাঁর পশ্চাতে বাদকের দল। সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি অমনি ধাবিত হয় তাঁর প্রতি; রামানন্দের দৃষ্টিও

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।৯

আকৃষ্ট হয় সন্ন্যাসীর প্রতি। এই সন্ন্যাসীকেই তো তিনি আজ ধ্যানের সময় দেখেছেন। কে ইঁনি ?

দোলা থেকে নেমে অধীর চরণে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় প্রণত হলেন। তিনি ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে রায়কে হাত ধরে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি রায় রামানন্দ ?

—হ্যাঁ, আমিই সেই অধম দাস।

শুভক্ষণটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল।

মহাপ্রভু ও রামানন্দ দুজনে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে যায় ভগবান ও ভক্তের সত্তা।

উভয়েই উৎকণ্ঠিত নিভৃত আলাপের জন্য।

দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো। প্রভু প্রতীক্ষা করছেন। একটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করে রায় এসে মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। বসলেন দুজনে এক নিভৃত নির্জন স্থানে। উভয়েই কৃষ্ণ-রসে রসিক। একজনের মধ্যে তীক্ষ্ণ পিপাসা, অন্যজন মেটাবেন সেই তৃষ্ণা। কারণ তিনি ভিন্ন এই তত্ত্বের আর দ্বিতীয় বক্তা নেই। আরম্ভ হয় কথাবার্তা দুজনের মধ্যে। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

প্রভু। রায়, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায়। স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

প্রভু। শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ জানতে চাই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

রায়। আমার কথার সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোক আপনাকে শোনাচ্ছি :

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥ ৩।৮।৮

—'পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হয়ে থাকেন, বস্তুত বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নেই।'

প্রভু তখন বলেন, রায়, এসব বাইরের কথা শুনিও না—একটু এগিয়ে চলো।

রায়। তাহলে কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ সকল সাধ্যের সার। এর সমর্থনে গীতায় প্রমাণ আছে।

প্রভু। না রায়, এও বাইরের কথা, আর একটু গভীরে যাও।

আশ্চর্য, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে যে কর্ম এবং কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দিলেন, গৌরহরি তাকেও গুরুত্ব দিলেন না। প্রভু তাই রায়ের কথায় সন্তোষলাভ করলেন না। তখন রামানন্দ বললেন, 'স্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার।' এর সমর্থনে যথাক্রমে ভাগবত ও গীতা থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রভুকে শোনালেন।

প্রভু। এহো বাহ্য।

রামানন্দ বিস্মিত। কর্ম, যোগ, জ্ঞান—সব সাধনার কথা বর্ণনা করে, সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ যেন সবচেয়ে গোপনীয় কথাটি অর্জুনের কানে কানে বললেন—এইবার শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে লাভ করার উপায়টির কথা। ধর্মাধর্ম, সব কিছু ত্যাগ করে তুমি আমার শরণ নাও, তাহলে তোমাকে বুকে তুলে নেব আমি।

প্রভু। রায়, এও বাইরের জিনিস, আরো গভীরে চলো।

রায়। 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।'

এর সমর্থনে গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলেন। তথাপি প্রভুর কাছে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিও যথেষ্ট বলে গৃহীত বা স্বীকৃত হলো না। তিনি কিন্তু পরাবিদ্যা তথা পরাভক্তিকে 'বাহ্য' বলেন নি। বলেছেন, ঐশ্বর্য জ্ঞানমিশ্রা, মমত্ব-বোধহীন, সংকীর্ণ যে কৃষ্ণভক্তি, তাই-ই বাইরের জিনিস। কংসের কারাগারে দেবকী আর দ্বারকায় প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা এই ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই নামান্তর মাত্র ছিল। তাই একে তিনি বাইরের জিনিস বলে চিহ্নিত করলেন।

তখন রসিকশেখর রামানন্দের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়; 'জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার।' ভাগবত থেকে এর সমর্থনে শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন, যাঁরা সাধুসঙ্গে থেকে, তাঁদের মুখ থেকে শ্রীভগবানের চরিতকথা বা তাঁর ভক্তদের কথা শ্রবণপূর্বক জীবনধারণ করেন, ত্রিভুবনের মধ্যে তাঁদের দ্বারাই প্রায়ই তুমি বশীভূত হও।

অকাট্য যুক্তি। অতি ভাবগর্ভ এই উক্তি। প্রভুকে তখন স্বীকার করতে হলো, হ্যাঁ, এ হয়।

রামানন্দ এতক্ষণ নানা পথ দিয়ে তাঁর মহান্ শ্রোতাটিকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন সেইখানে যেখানে জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি রূপান্তরিত হয় বিশুদ্ধ প্রেমে। বৃন্দাবনে ঐশ্বর্যের কত না লীলা ঘটেছিল—যশোদা তাঁর গোপালের মুখবিবরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গোপালকে রজ্জু দিয়ে বাঁধতে গিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত যশোদার একবারও মনে হলো না—ইনি তো গোপাল নন, ইনি যে বিশ্বপালক বিশ্ববিধাতা। জ্ঞানী ভক্ত উদ্ধব, ভক্ত দেবর্ষি নারদ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তের প্রকৃত মহিমা জানতেন না বা বুঝতেন না। কৌশলে এঁদের কাছে প্রকটিত করেন কৃষ্ণভক্তের মহিমা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেসব কাহিনী আছে ভাগবতের পাতায় পাতায়। মহা জ্ঞানী উদ্ধব নিজেকে ব্রজগোপীদের প্রেমের পদমূলে লুণ্ঠিত করে বলেছিলেন, তিনি যেন বৃন্দাবনের লতা, গুল্ম, তৃণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গোপীদের অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম আর স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা প্রত্যক্ষ করে নারদেরও সেই একই অনুভূতি হয়েছিল।

তাই তো প্রভু আনন্দের সন্ধান পেয়ে, রামানন্দকে বললেন, হ্যাঁ, এ হয়, তবে আরো একটু নিগূঢ় কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে। তখন রসিক বক্তা বললেন : 'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।'

এবার প্রেম রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে আসা গেল।

অদূরেই দেখা যায় সেই প্রেম-দেউল।

শ্রবণ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান যখন হৃদয়কে শ্রদ্ধাভক্তি-লাভের যোগ্য করে তোলে, তখনই সাধক এই দুর্লভ প্রেমভক্তি লাভ করে ধন্য হন, পূর্ণ হন, তৃপ্ত হন। তখনই চিত্তে স্ফুরণ হয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানের। তখন সাধক উন্মুখ হয়ে উঠবেন দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি নিজ ভাবানুযায়ী ভজনের জন্য।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার॥[১]

এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে সবই আছে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি, আর বাৎসল্যের মমতাধিক্য। সকলের উপর আছে কায়মন-প্রাণ, জাতিকুলমান, সর্বস্ব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। কান্তাপ্রেমেই সকল রসের পূর্ণতা।

প্রভু অধীর আনন্দে বলেন, 'রায়! সাধ্যের সীমা এই পর্যন্তই। কিন্তু তোমার রসভাণ্ডারে আর কি কিছুই নেই? যদি আরো কিছু থাকে তবে বলো।'

রামানন্দের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। এরও পর? কি আর আছে এর পরে? এই পৃথিবীতে এমন কথা আর তো কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে নি। তবুও বললেন, ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা। আর তাঁর প্রেমই সাধ্যের চরম কথা। ভাগবত থেকে শ্লোক তুলে প্রমাণ দিলেন। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকেও রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন।

—রায়, তোমার কাছে আমার আসা সার্থক হলো। আমি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণকথা কিছুই জানি না। কৃপা করে আমাকে শোনাও কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব।

—ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্যময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। বেদে যাঁকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ', শ্রীকৃষ্ণ সেই ঘনীভূত মূর্তি, অখিলরসামৃতসিন্ধু।

—রায়, কৃপা কর। যুজনার বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণনা করে আমাকে অমৃতময় করে তোল।

—বলবার তো আর কিছু নেই, বলবার সাধ্যও নেই। তবে একটা গান শোনাতে পারি।

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করে গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে রায় গাইলেন :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সে রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি ! সেসব প্রেমকাহিনী।
কানু ঠামে কহবি, বিছুরল জানি ॥
ন খোঁজলু দূতী, না খোজলু আন।
দুঁহুক মিলন মাঝত পাঁচবাণ ॥
অব সোঈ বিরাগে তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন-রীতি ॥[১]

তখন লীলারসে উচ্ছলিত, উদ্বেলিত হয়ে প্রভু গভীর আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়-বদ্ধ করলেন। দশ দিন বিদ্যানগরে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করে এবারে প্রভু বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। বিদায়বেলায় পরম ভক্ত, মহা অধিকারী রায় রামানন্দকে কৃতার্থ করলেন তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে :

তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।[২]

এই অপূর্ব রূপ দেখে, আনন্দে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন রামানন্দ।

॥ ষোলো ॥

এবার প্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

সেই সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁকে নিত্যানন্দ পথ ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এনেছিলেন।

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সে যাত্রায় তাঁর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নি। তারপর দীর্ঘদিন গত হয়েছে। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করেছেন বছর দুই। তারপর নীলাচলে ফিরে এসে ভক্তসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। রথযাত্রার সময় গৌড়দেশ থেকে যেসব ভক্ত আসতেন তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা নিয়ে আলোচনা করতেন, কখনো বা নিজের মায়ের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন।

বিদায় সময় আসন্ন।

নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু একদিন গোপনে কথাবার্তা বললেন। তাঁকে প্রতি বছর নীলাচলে না এসে, গৌড়ে থেকে ভক্তি বিলাবার অনুরোধ করলেন। অনুরোধ করলেন দার-পরিগ্রহ করে সংসারধর্ম পালন করতে। এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আমরা গৃহস্থ, বিষয়ী, আমাদের সাধনা কি? গৌরহরি উত্তর দিলেন:

কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।

আরেকজন ভক্তের প্রশ্ন: 'বৈষ্ণব চিনিব কেমতে?' অমনি প্রভু বললেন, যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনবে তিনিই বৈষ্ণব আর বৈষ্ণব মাত্রই পূজ্যশ্রেষ্ঠ। নাম থেকেই নববিধা ভক্তি হয়, নাম দীক্ষাদির অপেক্ষা রাখে না। জিহ্বায় স্পর্শমাত্রে আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে আর তাতেই জীবের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিশেষ অনুরোধে একদিন তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন।

দক্ষিণ থেকে ফিরবার পর ভক্তের আগ্রহ ও আকুলতায় দু' বছর অতিক্রান্ত হলো। তৃতীয় বর্ষে রথযাত্রাদির উৎসবের শেষে, প্রভু বৃন্দাবন-যাত্রার সংকল্পে দৃঢ় হলেন। শরৎকাল। বিজয়া দশমীর দিন প্রভু যাত্রা করলেন। নীলাচল থেকে যাত্রা করে প্রভু যখন কটকে পৌছলেন, পিছনে দোলায় চড়ে রায় রামানন্দ এসে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে নিবেদন করলেন প্রভুর আগমন-বার্তা।

নিজের রাজধানীতে পরম দেবতার পদধূলি পড়েছে।

এই সংবাদ জেনে, মহারাজা পুলকিতচিত্তে সসম্ভ্রমে ছুটে এসে প্রভুর পদতলে লুণ্ঠিত হলেন। এবার বিষয়ী বলে অবজ্ঞাত হলেন না. প্রভু মহারাজকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। প্রভুর সঙ্গে চলেছেন অনেক ভক্ত—স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে গদাধরকে তাঁর সঙ্গে যেতে নিষেধ করে প্রভু বললেন, 'গদাধর! তুমি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে এসো না।'

—তুমি যেখানে সেখানেই তো নীলাচল-ক্ষেত্র।

—শ্রীক্ষেত্রেই তুমি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করবে, সংকল্প করেছিলে।

—রসাতলে যাক আমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

—কিন্তু তোমার গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। তাঁর সেবা তো তুমি ত্যাগ করতে পার না?

—তোমার চরণ-দর্শনে গোপীনাথের সেবা থেকে কোটি গুণে অধিক সেবা হয়।

—কিন্তু সেবাত্যাগ অপরাধের জন্য যে আমি দায়ী হব?

—না, তোমার কোনো দায় নেই, আমার অপরাধের দায়িত্ব আমারই।

যদি আমাকে সুখী করতে চাও, তবে আমার শপথ আর কিছু বলো না। ফিরে যাও নীলাচলে।

অগত্যা গদাধরকে নিরানন্দ নীলাচলে ফিরে আসতে হলো।

চলতে চলতে প্রভু যাজপুর এলেন। রায় রামানন্দ এই পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে এসেছেন, রাত্রিদিন কৃষ্ণকথায় মগ্ন হয়ে আছেন দুজনে, কিন্তু এইবার তাঁর বিদায়ের পালা। রায়কে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে প্রভুর বুক ফেটে যায়, তবুও বিদায় দিতে হলো। রায় মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়লেন। তখন রায়কে কোলে নিয়ে প্রভু কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে দু' হাতে যেন সব কোমলতা ত্যাগ করে প্রভু উঠে এলেন।

আরম্ভ হয় একক পরিক্রমা।

উড়িষ্যা রাজসীমান্ত শেষ হলো—শুরু হলো যবন অধিকারীর রাজ্য। সেই যবনরাজ হিন্দু বেশ ধারণ করে প্রভুকে দর্শন করতে এলেন। দূর থেকে প্রভুকে দর্শন করা মাত্রই যবনের অন্তর পুলকে আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—হিন্দু ভক্তের মতোই মাটিতে মাথা নত করে তিনি দণ্ড-প্রণাম করলেন। কৃপায় তাকে অঙ্গীকার করলেন, অধিকারী ধন্য হলেন। দীর্ঘকালের বিরোধের অবসান হলো—যবন ও হিন্দু দুই রাজ অধিকারী প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হলেন।

বৃন্দাবনের পথে প্রভু এলেন শান্তিপুরে।

এখানে অদ্বৈত-গৃহে কয়েকদিন এবং অন্যান্য ভক্তগৃহে কয়েক দিন বাস করে চললেন বৃন্দাবনের পথে, সঙ্গে চলেছে অগণিত লোক। উপনীত হলেন রামকেলি গ্রামে। এখানে শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন দান করে তাঁদের জীবন ধন্য করলেন। প্রভুর চরণস্পর্শ মাত্রেই সাকরমল্লিক ও দবীরখাসের জীবন রূপান্তরিত হয়ে গেল—তিনিই তাঁদের নবজীবনে নতুন নামকরণ করলেন—রূপ ও সনাতন। প্রভুর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক—এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নয়, এই বলে সনাতন নীরব হলেন।

ঠিক কথাই বলেছেন সনাতন।

এত লোকজন পরিবৃত হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার রীতি নয়। প্রভু বুঝলেন সনাতনের ইঙ্গিতের সত্যতা। তবু তিনি এগিয়ে 'কানাই-নাটশালা' নামক একটি স্থান পর্যন্ত এলেন। কিন্তু মন সহসা বিমুখ হয়ে চললো—তিনি বিপরীত পথ ধরলেন—নীলাচলের পথ। শান্তিপুরে অদ্বৈত বসে আছেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে গৌরহরির শুভ আগমন। আনন্দ আবেগ দিশাহারা আচার্য। খবর পেয়ে নবদ্বীপ থেকে ভক্তদের সঙ্গে শান্তিপুরে এলেন শচীমাতা।

মায়ের চরণে মাথা লুটিয়ে দিলেন পুত্র।

দীর্ঘ বিচ্ছেদে কাতর মায়ের বুকে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রেখে, দুই হাতে বৃদ্ধা জননীর গলা জড়িয়ে শিশুর মতো ডাকতে থাকেন প্রভু—

মা! তুমি কেঁদো না, আমি তোমার অধম ছেলে। আমায় ক্ষমা কর মা। অমনি শচী দেবী ভুলে গেলেন সমস্ত দুঃখ-বেদনা—বুকের নিধিটিকে বুকে তুলে নিলেন। অপূর্ব এই দৃশ্য কল্পনা করেও আনন্দ।

—নিমাই! যে-কদিন এখানে থাকবে আমি তাকে ভিক্ষা দেব।

শচীমাতার এই অনুরোধ ভক্তরা রাখলেন।

জননী তাঁর জীবনের সাধ মিটিয়ে এই শেষ ভিক্ষা দিলেন। পুত্রও সেই সাধ মেটালেন। ভক্তরা আনন্দ পেলেন, শচীদেবীও আনন্দ পেলেন—তাঁরা সকলেই গৌরহরির দর্শনলাভে ধন্য হলেন। কিন্তু বাকী রইলেন শুধু একজন।

তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

সংসারে যিনি সবচেয়ে আপন, ভাগ্যের পরিহাসে তিনিই আজ তার সবচেয়ে পর। যিনি অতি কাছের, তিনিই আজ দূরের। একবার কি দেখা হবে না? কেঁদে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর। হয়ত বা কেঁদে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভেরও অন্তর। বিষ্ণুপ্রিয়া আজ আর কিশোরী নন. পূর্ণ যুবতী।

সন্ন্যাসীকে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে হয়।

দীর্ঘ ছয় বছর পরে জন্মভূমির কোলে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

নবদ্বীপের সেই পরিচিত পথঘাট—প্রতি বৃক্ষলতা সকলেই আজ পরমানন্দে তাদের নিমাইকে যেন আকুলভাবে জড়িয়ে রাখতে চাইল। প্রভু তাদের সস্নেহ স্পর্শ দিতে দিতে চলেছেন ধীর পদক্ষেপে। ক্রমে এসে নিজগৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর কত লোক।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রহর গুণছেন গৃহকোণে বসে।

কখন দয়িত এসে দাঁড়াবেন সম্মুখে।

দাঁড়াবেন তিনি অতি নিকটে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আশঙ্কায় আকুল হয় প্রাণ—যদি দর্শন না দেন?

প্রভু ভিতরে প্রবেশ করলেন না—এসে দাঁড়ালেন গৃহের বাহিরে পথে। মলিন বসনা, তপকৃশা বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর কাঁপতে থাকে—বাইরে তিনি যাবেন কি? এ শুভক্ষণ তো আর আসবে না এ জীবনে।

নিভৃত অন্তঃপুর থেকে বের হলেন নির্বাককুণ্ঠিতা কুলবধূ।

এসে দাঁড়ালেন লক্ষ চক্ষুর সম্মুখে নতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া।

জনতা স্তম্ভিত, মর্মাহত। তাদের নিমেষহীন দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত। যুক্ত-করে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া লুটিয়ে পড়লেন প্রিয়তমের পদতলে—চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন দয়িতের রাঙাচরণ দুটি।

—ওঠো বিষ্ণুপ্রিয়া, বলো তোমার কি প্রার্থনা ?

—আমাকে পাথেয় দাও, প্রভু। তুমি কি আমাকে বাদ দিযে জগৎ উদ্ধার করবে ? আমি কি এ জগতের নই ?

তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই। শুধু এই দুটি পাদুকা মাত্র আছে। এই-ই তুমি নাও।

নবদ্বীপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন নবদ্বীপচন্দ্র।

এ যেন সেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ।

প্রভু আসছেন।

নীলাচলের পথে পথে সংবাদ রটে গেল।

সার্বভৌম, রামানন্দ, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ অধীর বিস্ময়ে ছুটে অগ্রসর হলেন। এরই মধ্যে বৃন্দাবন-ভ্রমণ শেষ করে তিনি ফিরে এলেন আমাদের আনন্দ দেবার জন্য ?

—না গদাধর। বৃন্দাবনে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি এখনো। মনে করেছিলাম গৌড়দেশ দিয়ে বৃন্দাবনে যাব, জননী ও জাহ্নবীর চরণ দেখে। এই ভেবে গৌড়ে গেলাম। হাজার হাজার ভক্ত সঙ্গ নিলো—লাখ লাখ লোক এল কৌতুক দেখতে। লোকের সংঘট্টে পথ চলা দায় হলো। গেলাম আমি রামকেলিগ্রামে। রূপ-সনাতন সেখানে মিলিত হলেন আমার সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরবার সময়ে সনাতন একটি ইঙ্গিত দিলেন: বৃন্দাবন-যাত্রার এই রীতি নয়। একাকী অথবা দুই-একজন নিয়ে যাওয়াই উত্তম। এইবার তোমরা সবাই মিলে যুক্তি করে প্রসন্নচিত্তে আমাকে বৃন্দাবন যাবার উপায় করে দাও। মনে হয় গদাধরকে দুঃখ দিয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমার বৃন্দাবন যাওয়া ঘটল না।

—না প্রভু! বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রয়োজন কি তোমার? তুমি যেখানে থাকো, সেখানেই তো বৃন্দাবন। তবুও লোকশিক্ষার জন্য তুমি যাবে, বর্ষার চারমাস কেটে যাক, তারপরে যেও।

দেখতে দেখতে চারমাস কেটে গেল।

শরৎকালের পূর্ণিমার রাতে প্রভু নীলাচল থেকে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। নিজের ভক্তদের মধ্যে একজনকেও সঙ্গে নিলেন না। নিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক নতুন গৌড়ীয়া ভক্তকে। রাতে জগন্নাথের আদেশ গ্রহণ করে, শেষ রাতে প্রভু চললেন বৃন্দাবনের পথে। রাজপথ, নগরপথ ত্যাগ করে প্রভু ঝাড়িখণ্ডের নির্জন অরণ্যপথ দিয়ে যাত্রা করলেন।

নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লইঞা।
হস্তীব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ড শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁহা করে স্থিতি।
সেইসব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥[১]

চলতে চলতে প্রভু বারাণসী এলেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করছেন। অদূরে তপন মিশ্রও স্নান করছিলেন। প্রভু যখন পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন তখন সেইখানে তপন মিশ্রও তাঁকে দেখেছিলেন। কিন্তু সে কতকালের কথা। শুধু দেখা নয়—তাঁকে প্রভু সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই তো সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘ গৌরতনু—তখন সবাই জানত এঁকে নিমাই পণ্ডিত বলে। শুনেছিলেন ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

মিশ্র প্রভুর চরণে প্রণত হলেন।

তিনি উঠিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষার

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ব্যবস্থা হলো। বৈদ্য চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভু এসেছেন শুনে তাড়াতাড়ি উপনীত হলেন মিশ্রভবনে।

—চন্দ্রশেখর! এখানে তোমরা কেমন আছ?

—বড়ো মনঃকষ্টে আছি প্রভু।

—মনঃকষ্ট! কেন? এতো শিবধাম, পরম পুণ্যতীর্থ।

—কিন্তু বড়ো কঠিন স্থান কাশী।

—একটু বুঝিয়ে বলো, চন্দ্রশেখর।

—কেবল 'মায়া ব্রহ্ম, ঈশ্বর মায়া'—এছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই না এখানে। তাই আমরা দুজন তোমার চরণচিন্তা সার করে এখানে পড়ে আছি। তুমি বৃন্দাবন চলেছ। কৃপা করে কয়েক দিন এখানে অবস্থান করে আমাদের তৃষিত হৃদয়কে কৃষ্ণরসামৃতে সঞ্জীবিত করে যাও, এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। প্রভু দশ দিন রইলেন কাশীতে। এই দশ দিন মিশ্রের অনুরোধে অন্য কোথাও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না।

দেখতে দেখতে গৌরহরির অলৌকিক রূপ, গুণ, ভাব ও প্রেম সম্বন্ধে লোক জানাজানি হতে থাকে, বৃদ্ধি পায় লোকের ভিড। ক্রমে বিখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের কানে এলো প্রভুর কথা। তিনি তাঁর অনুগামীদের সাবধান করে দিলেন এঁর সংস্পর্শ পরিহার করে চলবার জন্য। একদিন, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সভাতে বসে বেদান্ত পড়াচ্ছেন। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে বললেন:

এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সেসব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
নেত্রযুগে অশ্রুজল গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গর্জন॥
জগৎ-মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তার সব অনুপাম॥[১]

ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনে প্রকাশানন্দ হাসলেন। তাচ্ছিল্যের হাসি। অবজ্ঞার হাসি। শিষ্যদের সাবধান করে দিলেন এই বলে—অলৌকিক রূপ ও সৌন্দর্যের ফাঁদ পেতে এই ভাবুক দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, আর মূর্খেরা আকৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে, বেদান্ত ভুলে যে শুধু কীর্তন নিয়ে মত্ত থাকে সেই চৈতন্যের ভাবকালি এই কাশীতে বিকাবে না।

তখনকার মতো প্রভু নিরস্ত হলেন।

বৃন্দাবনে চললেন বলভদ্রকে নিয়ে। প্রয়াগে এসে ত্রিবেণী-মণ্ডলে স্নান করলেন। তিন দিন রইলেন। নামপ্রেম বিতরণ করতে করতে, বহু লোক সঙ্গে যাত্রা করলেন মথুরার পথে।

॥ সতেরো ॥

যেতে যেতে যেখানে দৃষ্টিগোচর হয় যমুনা অমনি প্রভু ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। সেবক ভট্ট সযত্নে রক্ষা করেন প্রভুর অচেতন দেহখানিকে। ক্রমে উপনীত হলেন মথুরার সীমানায়। মথুরা দেখা মাত্র তিনি যেন আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন না—অচিন্তনীয় প্রেমের প্রকাশ আরম্ভ হয় দিব্য তনুতে। কতক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে, স্নান করলেন বিশ্রামঘাটে। স্নান সেরে ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছেন এমন সময়ে সেখানে এক বিপ্র এসে প্রভুর চরণ দুটি ধারণ করে প্রেমে কাঁদতে থাকেন।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গৌরহরি লক্ষ্য করলেন ব্রাহ্মণের শরীরেও অপূর্ব প্রেমের প্রকাশ। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

আর্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হইতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥[১]

তখন বিপ্র বলেন :

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥
কৃপা করি তেঁহ মোর নিলয়ে রহিলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।[২]

—বিপ্র ! আপনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য। তবে তো আপনি আমার গুরু, আমার প্রণম্য।

গৌরসন্ন্যাসী বিপ্রের চরণ বন্দনা করলেন। তারপর বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ নিলয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বিপ্রের হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন যদিও তিনি ছিলেন সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ।

বৃন্দাবনের মাটিতে প্রভুর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। স্থাবরজঙ্গম—মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা সবাই, কেন কে জানে, পুলকিত হয়ে উঠলো। তাদের হারানো নিধি বুঝি বহুদিন পরে ফিরে এসেছেন। মন বলছে, এই তো সেই, কিন্তু এ আবার কি অভিনব খেলা। কালো রঙটি কোথায় লুকালেন। এযে দেখি আগাগোড়া রাধারূপে ঢাকা, শুধু মুখের উচ্চারিত কথায় কালো রঙ—কৃষ্ণনাম !

বিপ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু যমুনার ঘাটে ঘাটে স্নান করলেন। প্রতিটি শৈল, বন-উপবন, কুঞ্জবিতান, সবই দর্শন করলেন পুলকিত মনে। দর্শন করতে করতে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়ছেন। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য :

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ ॥
ফল-ফুলে ভরিডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায় ॥[৩]

১,২,৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রতি বৃক্ষলতাকে বন্ধুর মতো প্রভুও আলিঙ্গন করতেন। বিগত দিনের স্মৃতির আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে তাঁর অন্তর। আজ মধুময় হয়ে উঠেছে ব্রজধাম—নিখিল ভুবন! কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে মথুরা-মণ্ডল—তার প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে।

দৃশ্য কিন্তু এইখানেই শেষ নয়।

চিন্ময় বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষে থাকে শাশ্বত শুকসারী।

রাধা বড়, না কৃষ্ণ বড়—এই নিয়ে এদের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ।

সেই শুকসারী আজ তাদের অনাদি, অনন্ত, আনন্দসুন্দরকে দেখতে পেয়ে উড়ে এসে ডালে বসল। প্রভু শুকসারীর মুখে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা শুনতে লাগলেন তন্ময় চিত্তে।

শুক বলে—বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী সঃ শারিকে।

বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহন॥[১]

—হে শারিকে! বিশ্বের নারীকূলের মনোহারী, গোপবনিতাদের সঙ্গে সর্বদা বিলাসকারী, বংশীধারী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।

শারী তখন পরিহাস করে বলে:

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।

অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিত॥[২]

—শুক! তোমার মদনমোহনের কথা আর বেশী বলো না। যতক্ষণ আমার রাই কৃষ্ণের পাশে থাকেন ততক্ষণ তিনি মদনমোহন, নইলে শুধুই মদন।

শুকসারী মুখে রাধাকৃষ্ণের মহিমা শুনতে শুনতে ক্রমেই প্রভুর ভাবান্তর হয়, লুপ্ত হয় দেহাবেশ, আবার সামনে চেয়ে দেখেন নীলকণ্ঠ ময়ূর নৃত্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে—

ময়ূরকণ্ঠ দেখি কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈল।

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥[৩]

অমনি সেবক ভট্ট আর বৃন্দাবনের সেই কৃষ্ণপ্রেমী বিপ্র দুজনে অধীর

১,২,৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হয়ে উত্তরীয়ের অঞ্চল ভিজিয়ে প্রভুর ললাট মার্জনা করেন। কাপড়ের আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে, কানে কৃষ্ণনাম শোনাতে শোনাতে অনেকক্ষণ বাদে প্রভুর বাহ্যচেতনা ফিরে এলো।

কিন্তু আবেশ দূর হয় না।

'কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।

ব্রজের মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

গড়াগড়ি দেন আর শ্রীমতীর মতো কেঁদে কেঁদে ডাকেন, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম দয়িত আমার, হে দীননাথ, একবার দেখা দাও। লীলাস্থলে এলেই পূর্বলীলার স্মরণ হয়। বৃন্দাবনের লোক ক্রমেই প্রভুর প্রতি প্রবল এক আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। ভক্তের কাছে নিজেকে আর লুকাবার সাধ্য রইল না। তাদের সবাইকে কৃপা করলেন কৃপানিধি গৌরহরি।

প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণের দুটি প্রধান ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়।

এখানে এক পরমধার্মিক পীর ছিলেন, জাতিতে পাঠান। প্রভুর প্রতি তাঁর মনে পরম শ্রদ্ধার উদয় হলো। তিনি অদ্বয়বাদ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন করবার জন্য আরম্ভ করলেন শাস্ত্রালোচনা। পীর সাহেবের শাস্ত্রবাক্যে প্রভু তার বুদ্ধি খণ্ডন করে স্থাপন করলেন ষড়ৈশ্বর্যময় পূর্ণ ব্রহ্মবাদ। তিনি প্রতিপন্ন করলেন ঈশ্বরের সঙ্গে সমগ্র সম্বন্ধ স্থাপন করে তাঁর সেবালাভ করা এবং প্রেমময় ভগবানের প্রেমলাভ করাই জীবের সাধনা ও কাম্য।

প্রভুর কথায় পীর সাহেবের অন্তর থেকে যেন একটা ব্যবধানের আড়াল ঘুচে গেল, পরম প্রেমময়ের প্রেমের এক নব অভ্যুদয় হলো অন্তরলোকে, তিনি নিজেকে ধন্য মানলেন। গৌরহরি তাঁকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন—সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিলেন তাঁকে। পীর ধন্য হয়ে গেলেন। নবজীবনে নতুন নামে তাঁকে অভিহিত করলেন—রামদাস।

অপর ঘটনাটি এই। পাঠান বিজুলী খান, রাজকুমার। বয়স অল্প, দেখতে প্রিয়দর্শন। প্রভুর রূপলাবণ্য ও অমৃতময় কথায় তার

অন্তর যেন এক অজানা আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে গেল। প্রভুর পদে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো তার মন, প্রাণ। পরম স্নেহে, পরম প্রেমে আপন শ্রীচরণ দুখানি প্রভু বিজুলী খানের মাথায় তুলে ধরলেন। মুহূর্তে যেন বিজলীপ্রবাহ খেলে গেল পাঠানের সমস্ত শরীরে, দেহের অণুপরমাণু যেন নৃত্য করতে লাগলো ময়ূরের মতো। সচ্চিদানন্দ রসসাগরে ডুবে গেলেন বিজলী খান। নবজীবনে, তার নতুন নাম হলো পাঠান বৈষ্ণব।

বৃন্দাবনে দুই পাঠানের এই রূপান্তর আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রভুর নবদ্বীপলীলার সেই ইতিহাস। ঠিক এমনটি ঘটেছিল নবদ্বীপে। রাজশক্তি ও রাজদম্ভে গর্ব চাঁদকাজী নবদ্বীপে কীর্তন নিষেধ করেছিলেন। অত্যাচারের ভয়ে শ্রীবাসাদি ভক্তদের মনে ভয় ঢুকেছে। তাই ভয়হারী ভগবান ভক্তকে ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই কাহিনী সবিস্তারে আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নবদ্বীপে কাজী-উদ্ধার প্রভুর নদীয়া-লীলার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। কাজী, বিজুলী খান ও পীরসাহেবের জীবন গৌরহরির কৃপায় রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত, ধর্মান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নয়।

এইভাবে প্রেমধর্মে উত্তরভারতের সকল মানুষকে দীক্ষিত করে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এলেন প্রয়াগে। শ্রীরূপ ও অনুপম সংসার ত্যাগ করে সেখানে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। শ্রীরূপের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-নিরূপণের শক্তিসঞ্চার করে, শিক্ষা দিয়ে, প্রভু তাঁকে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতর ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীরূপকে প্রয়াগে রেখে তিনি যাত্রা করলেন বারাণসীর পথে।

বারাণসী।

গৌরহরি আছেন চন্দ্রশেখরের গৃহে।

এইখানে এসে সনাতন মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি এসেছেন দীন ভিখারীর বেশে, গায়ে শুধু একখানি ভোটকম্বল। চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে পথক্লান্ত, জীর্ণ মলিনবেশ সনাতন

এসে বসলেন। অন্তর্যামী প্রভু জানতে পারলেন কে এসেছেন। চন্দ্রশেখরকে বললেন, বাইরে একজন বৈষ্ণব এসেছেন তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

চন্দ্রশেখর বাইরে এসে দেখলেন বৈষ্ণব নয়, এক দরবেশ বসে আছেন। ভেতরে এসে সেই কথা জানাতেই প্রভু বললেন, তাকেই আনো। ঘরের মধ্যে এসে সনাতন নিজেকে উজাড় করে দিলেন প্রভুর চরণে। যেন এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রভু তাঁকে হৃদয়ে ধরবার জন্য প্রসারিত করে দিলেন দুই হাত, সনাতন কিন্তু ধরা না দিতে ব্যগ্র, বলেন, 'মোরে না ছুঁইহ আমি হীন।' তাঁর নিষেধ না শুনে প্রভু অধিকতর গাঢ়ভাবে সনাতনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। তখন দুজনের চক্ষু থেকে পড়তে থাকে গলদশ্রু

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥[১]

কিছুক্ষণ পরে প্রভু সনাতনকে হাত ধরে ঘরের ভেতরে গেলেন। নিজের আসনের পাশে তাকে বসিয়ে নিজে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে থাকেন—'শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মাজন।' সনাতন সসঙ্কোচে বলেন—'মোরে প্রভু না কর স্পর্শন।'

—তোমাকে কি আমি অমনি স্পর্শ করছি, তোমাকে স্পর্শ করছি নিজে পবিত্র হবার জন্য।

প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥[২]

—তুমি সাক্ষাৎ ভাগবত। তোমার মতো পরম ভাগবতের স্পর্শলাভেই দেহের সার্থকতা। তোমার মতো ভক্তের দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা। তোমার মতো পরম সজ্জনের গুণকীর্তনেই এই জড় জিহ্বা কৃতকৃতার্থ।

প্রভুর কথা শুনে সনাতন দৈন্যে বিনয়ে সংকোচে মাথা নীচু করে রইলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, 'সনাতন, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাই মহারৌরব থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছেন।'

১,২, শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত

—প্রভু, কৃষ্ণকে ত আমি জানি না। আমি জানি শুধু তোমাকে।

প্রভু তখন তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। প্রভু সনাতনকে চুল দাড়ি গোঁফ ক্ষৌরী করে ভদ্র হয়ে আসতে বললেন। নির্দেশ পালন করে গঙ্গাস্নান করে এলেন সনাতন। চন্দ্রশেখর তাঁকে দিলেন একখানি নতুন বস্ত্র। সনাতন তা গ্রহণ করলেন না।

অতঃপর সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু ভিক্ষা করতে গেলেন তপন মিশ্রের বাড়িতে। আহারে বসে প্রভু সনাতনকে বসতে বললেন। সনাতন বসলেন না। প্রভু আহার করে বিশ্রাম করলেন। সনাতন প্রভুর শেষপাত্র নিয়ে গ্রহণ করলেন। তপন মিশ্রও সনাতনকে একখানি নতুন বস্ত্র দিতে গেলেন।

—আপনার পুরাতন বস্ত্র একখানা দিতে পারেন।

তাই পেলেন সনাতন। পরমানন্দে সেটি ছিঁড়ে দুই বহির্বাস ও কৌপীন করলেন। সনাতনের গায়ে একখানি দামী ভোটকম্বল ছিল। প্রভু ঐটির দিকে কয়েকবার তাকিয়েছেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝে বুদ্ধিমান সনাতন বাইরে গেলেন। এক গৌড়দেশবাসীকে অনেক মিনতি করে, নিজের মূল্যবান কম্বলখানি দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাটি নিয়ে, গায়ে জড়িয়ে প্রভুর সামনে এলেন। সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভু প্রসন্ন হলেন; বললেন, 'ভালই হলো—বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার।'

প্রভুর চরণতলে বসে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন সনাতন। সাধারণ প্রশ্ন নয়, পরমার্থ তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন কেউ নিজের শক্তিতে করতে পারে না। তাই বুঝি

প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥[১]

আরম্ভ হয় গৌরলীলার একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়—সনাতন শিক্ষা। দন্তে তৃণ নিয়ে, প্রভুর রাতুল চরণ দুটি ধরে অপরিসীম দৈন্যভরা ভাষায় সনাতন বলতে থাকেন :

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্তব্য আমার॥
কে আমি, কেন আমারে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানে মুঞি কেমন হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব পুছিতে নাহি জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহিবে আপনি॥[১]

সনাতনের দৈন্যে প্রভুর অন্তরে ব্যথা লাগে। বলেন, 'সনাতন, কৃষ্ণ কৃপায় তুমি কৃষ্ণতুল্য শক্তিধর। সকল তত্ত্বকথা ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ তোমার অধিগত।' আরো বলেন :

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শোন কহিয়ে তোমাতে॥[২]

সনাতন দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তবে 'মোরে কেন জারে তাপত্রয়'?

—জীব নিজের নিত্য স্বরূপত্ব ভুলে যখন বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে, তখনই মায়া তাকে সংসারে কর্মের বন্ধনে ও দুঃখের আবর্তে ফেলে অশেষ দুঃখ দেয়।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নরকে চুবায়॥[৩]

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ভগবানের দাসত্ব করাই জীবের পরম আনন্দ। জীব মায়ার আবর্তে পড়ে সেই আনন্দ ভুলেছে বলেই ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে।

সনাতনের তৃতীয় প্রশ্ন 'তবে কেমনে হিত হয়?' প্রভু উত্তর দিলেন :

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তার, মায়া তাহারে ছাড়য়॥[৪]

১, ২, ৩, ৪ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে বহির্মুখ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন কৃষ্ণ নিজে গুরুরূপে জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। শরণাগত হলেই জীবকে গ্রহণ করেন তিনি। গীতায় ভগবান এই প্রতিশ্রুতি অর্জুনকে দিয়েছিলেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

জীবতত্ত্ব বলতে বলতে কৃষ্ণতত্ত্ব এসে যায়। কৃষ্ণ অদ্বয়, জ্ঞানতত্ত্ব-স্বরূপ, সর্বাংশী সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ পরমতত্ত্ব। সনাতন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছেন, আর প্রভুর কণ্ঠ থেকে ঐশ্বর্যের কথা বেরিয়ে আসতে লাগল মূর্তিমতী বাণীরূপে। কিন্তু কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলতে গিয়ে প্রভুর মন কৃষ্ণমাধুর্য বর্ণনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। গৌরহরি কৃষ্ণের মদনমোহন রূপ সাগরে ডুবে যেতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তিনটি প্রশ্ন নিবেদন করেছেন সনাতন: ১. আমি কে? ২. আমি ত্রিতাপে জর্জরিত কেন? ৩. কিসে আমার হিত হবে? আর একটি প্রশ্ন অর্ধস্ফুটভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সনাতন: সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন—মানুষের জীবনের সাধ্য বা লক্ষ্য বস্তু কি, আর কি উপায় বা সাধন দ্বারা তা লাভ করতে পারা যায়? সনাতনের প্রশ্ন চিরন্তন কালের চিন্তাশীল মানুষেরই জিজ্ঞাসা। এমন প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সম্মিলন মনোবৈজ্ঞানিক এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল : কে আমি?

উত্তর দিলেন প্রভু সূত্রাকারে :

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
ঈশ্বরের শক্তি যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥[১]

ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ—ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট। তাই স্বরূপতঃ অভেদ হলেও ঈশ্বর ও জীবে ভেদ। এরই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, দীর্ঘকাল পরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রভু জীবব্রহ্মের এই বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করলেন।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সবশেষে তিনি সনাতনকে শ্রীভগবানের নরলীলার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে বললেন :

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

আরো বললেন : কৃষ্ণপ্রেম অকৈতব, নরলোকে এই প্রেম হয় না। এইভাবে দুই মাসে সনাতনের শিক্ষা শেষ করে প্রভু তাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি ভালো করেই জেনে গেলেন প্রভুর স্বরূপ। সনাতন রাজমন্ত্রী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন : প্রভু, কলিযুগে অবতার কে?

—সনাতন, 'অবতার নাহি কহে, আমি অবতার।'

—তাঁকে কেমন করে চিনব?

—লক্ষণ দেখেই অবতার চিনতে হয়।

—প্রভুর পীতবর্ণ, কৃষ্ণনাম-উচ্চারি যে কলির অবতার, তিনি কে? সত্য করে বলো তিনি কে? আমার সংশয় ঘুচে যাক।

—চাতুরালি ছাড়ো সনাতন।

সনাতন বুঝলেন চাতুরালি কার। লুটিয়ে পড়লেন তিনি কলিযুগের অবতারের চরণে। সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করলেন, প্রভু নীলাচলের পথে। কাশীতে সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

নীলাচল।

বৃন্দাবন থেকে শ্রীরূপ এসেছেন এখানে।

উঠেছেন যবন হরিদাসের কুটীরে।

প্রভু নিয়মিত এখানে আসতেন। সেদিন আসতেই রূপ তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি প্রগাঢ় আলিঙ্গনে রূপকে হৃদয়ে বদ্ধ করলেন। হরিদাসের কুটীরে আনন্দস্রোত বয়। সেই থেকে প্রতিদিনই এখানে এসে দুজনের সঙ্গে প্রভু কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান।

একদিন। দুপুরবেলা।

প্রভু এসে দেখেন রূপ, হরিদাস কেউ নেই। কুটীর শূন্য। হঠাৎ ঘরের চালার নীচে একটি তালপাতায় তার দৃষ্টি পড়ল। কৌতূহলী হয়ে প্রভু সেটি খুলে দেখেন এক অপূর্ব শ্লোক। পড়তে পড়তে তার দীপ্ত বদনে আনন্দের জ্যোতি খেলে যেতে লাগল। রূপ ফিরলেন, অমনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে রূপকে জড়িয়ে ধরে বলেন: 'গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে?' পরক্ষণেই মনে পড়ল প্রয়াগে রূপের দেহে মনে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ ঠিক করেছিলেন নাটকাকারে লিখবেন শ্রীকৃষ্ণলীলা। বৃন্দাবনে এবং পথেই দুই চারিটি শ্লোক মনে মনে গেঁথেছিলেন। নীলাচলে আসার পথে সত্যভামাপুরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন — যেন অপূর্ব জ্যোতিতে চারদিক উদ্ভাসিত করে অভিমানিনী সত্যভামা এসে রূপকে বলছেন, 'আমাকে নিয়ে তুমি পৃথক নাটক রচনা করো।' রূপ কিছুই স্থির করতে পারলেন না। নীলাচলে একদিন প্রভু নাটক সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর বললেন: 'পুরলীলা ও ব্রজলীলা নিয়ে দুটি পৃথক নাটক রচনা করো—কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হৈতে।

রোমাঞ্চ জাগে রূপের দেহ-মনে।

সত্যভামার আদেশের সঙ্গে প্রভুর প্রত্যক্ষ আদেশ মিলিয়ে 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নাম দিয়ে দুটি পৃথক নাটক রচনা আরম্ভ করলেন। একদিন রূপ নাটক লিখছেন, হঠাৎ প্রভু এসে 'কাঁহা পুঁথি লেখ?'—বলে পুঁথির একটি পাতা টেনে নিলেন। রূপের হস্তাক্ষর যেন মুক্তার পাঁতি আর সেই মুক্তার অক্ষরে লেখা যে শ্লোক, তা নয়নের সুখ, কর্ণের রসায়ন, আত্মার আনন্দ।

রূপের রচনা একা আস্বাদন করে প্রভুর আনন্দ পূর্ণ হয় না, সবাইকে শোনাতে ব্যগ্র হলেন তিনি। একদিন রায় রামানন্দ, সার্বভৌম, স্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিত রসজ্ঞ ভক্তদের নিয়ে হরিদাস-গৃহে রূপের নাটক শুনতে এলেন। রূপ যারপরনাই সংকোচ বোধ করেন

এত সুধী সজ্জন সমাগমে। 'নাটক শোনাও রূপ'—প্রভু আদেশ দিলেন। রূপ পাঠ করলেন :

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কডম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥[১]

—যা মুখের ভেতরে জিহ্বাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করে তুণ্ডাবলীলাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যা কর্ণপথে অঙ্কুরিত হয়েই অর্বুদসংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করে, এবং যা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে রঞ্জিত করে—এইরকম 'কৃ' ও 'ষ্ণ' অক্ষর দুটি যে কি অমৃত দিয়ে রচিত হয়েছে তা বলতে পারি না।

রায়, সার্বভৌম, স্বরূপ সবাই স্তম্ভিত, বিস্মিত।

নাম মহিমার এমন মাধুর্যময় আস্বাদন এর আগে আর কেউ করেনি। এত ভক্তি, এত মাধুর্য, এত কবিত্ব ছত্রে ছত্রে।

শ্লোকের পর শ্লোক পড়ে চলেছেন রূপ।

সবই তন্ন তন্ন করে বিচার করলেন রায়, সবই নিখুঁত অপূর্ব। প্রভু চেয়ে দেখছেন একবার বিদগ্ধ শ্রোতাদের প্রদীপ্ত মুখের দিকে, একবার রূপের কুণ্ঠিত মুখের দিকে। নিজের মুখে লেগে আছে বাৎসল্য, আনন্দ ও কৌতুকের হাসি।

—এবার ইষ্ট-বন্দনাটি পড় দেখি ভাই! রায় বললেন।

সঙ্কোচে রূপ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। উৎসাহ দিয়ে প্রভু বলেন : 'বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থ শোনাও রূপ!' তখন রূপের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় ইষ্ট-বন্দনার সেই অপূর্ব মহিম্নস্তুতি :

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥[২]

---

১ বিদগ্ধ মাধব।
২ ললিত মাধব।

—বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করবার জন্য যিনি করুণাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, সোনার থেকেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা যিনি সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন।

—এ অতি-স্তুতি। প্রভু মন্তব্য করেন।

—আমরা কৃতকৃতার্থ। বলেন শ্রোতাগণ।

পরের দিন দ্বিতীয় নাটক 'ললিত মাধব' পড়া হলো। রায় রামানন্দ প্রথমেই নান্দী শুনতে চাইলেন। আবার বিপদে পড়লেন রূপ। সম্মুখেই যে তিনি বসে, যার বন্দনায় তাঁর নাটক মুখর। তবুও পড়তেই হবে—ভক্তের আদেশ, প্রভুর আদেশ।

রূপ পড়লেন :

নিজপ্রণয়িতা সুধামুদয়মাপ্নুবন যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুণ্ঠিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃশশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু॥[১]

—যিনি এই পৃথিবীতে উদিত হয়ে নিজ প্রেমসুধা বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতের অজ্ঞানরূপ তমোরাশিকে নষ্ট করেছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যার বশীভূত, সেই শচীসুতরূপ শশী আমাদের অনির্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন।

ইষ্ট-বন্দনা দুটি শুনে রুষ্ট হলেন প্রভু। বলেন—এ কী রূপ।

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস-কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যা স্তুতি-ক্ষারবিন্দু?[২]

অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে রামানন্দ বলেন :

রূপের কবিত্ব অমৃতের পুর,
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥[৩]

কয়েক মাস নীলাচলে বাস করার পর, প্রভুর নির্দেশে বৃন্দাবনে

১ ললিত মাধব।
২,৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চলে গেলেন রূপ সেখানে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে। তাকে বলে দিলেন, 'তুমি বৃন্দাবনেই থেকো। একবার সনাতনকে এখানে পাঠিয়ে দিও।'

॥ আঠারো ॥

এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥

গৌর ভগবানের নীলাচল-লীলা, তাঁর নবদ্বীপ-লীলার মতোই স্বাদু—অতি সুস্বাদু। এ লীলায় প্রকাশ পেয়েছে শুধু বিরহ—কৃষ্ণ-বিরহজনিত আর্তি। কিন্তু সেই বিরহ দহন-জ্বালা তিনি নিজেই ভোগ করতেন। কেন? ভক্তগণ দুঃখ পাবেন এই ভয়ে। কিন্তু যখন তা বাইরে প্রকাশ পেতো তখন প্রভুর বৈকল্য অবর্ণনীয়। তখন একমাত্র রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা আর স্বরূপের গান শুনে তিনি শান্ত হতেন, ভুলে যেতেন বিরহ-সন্তাপ। তাঁর সুখের জন্যই এই দুই ভক্ত সবদা 'কৃষ্ণরস শ্লোক-গীতে' প্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন। স্বরূপ-রামানন্দের সৌভাগ্যের শেষ নেই—তারাই এখন প্রভুর অন্তরঙ্গ। সবক্ষণের সঙ্গী।

এই পরিবেশেই নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন রাজপুত্র রঘুনাথ দাস। অতুল বৈভব, রূপবতী ও গুণবতী ভার্যা—সব কিছু উপেক্ষা করে, গৃহত্যাগী হয়ে তিনি এলেন নীলাচলে। আসতেই তো হবে তাঁকে, কারণ তিনিই যে গৌরলীলার একজন চিহ্নিত পরিকর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের ছলনায় প্রভু যখন বৃন্দাবনে এসে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেইখানেই কিশোর রঘুনাথ সর্বপ্রথম তাঁকে দর্শন করেন। শুধু দর্শন করা নয়, একেবারে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেন প্রভুকে। তিনিও তাঁর এই ভক্তটিকে আত্মসাৎ করেন। কিন্তু তখন রঘুনাথের বয়স ছিল নিতান্ত অল্প; সেজন্য তাঁকে গৃহে ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেবা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার দর্শন সেই শান্তিপুরেই। রঘুনাথ তখন বিবাহিত। এ ঘটনা প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বছর পরে। প্রভু বৃন্দাবনের পথে গৌড়দেশে একবার দর্শন দিয়ে গেলেন। এলেন শান্তিপুরে—একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। রঘুনাথ সেই সংবাদ পেয়ে, অনেক অনুনয়ে অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে শান্তিপুরে এলেন। তার অন্তর তখন বৈরাগ্য-অনলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে—প্রবল হয়ে উঠেছে সংসার ত্যাগের বাসনা। সেই কথা প্রভুর কাছে নিবেদন করাতেই তিনি আদেশ করলেন :

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥[১]

গৃহে ফিরলেন রঘুনাথ শান্ত সমাহিত চিত্তে। মন দিলেন সংসারে। পুত্রের এই মতিগতি দেখে সন্তুষ্ট হন পিতামাতা আর নিশ্চিন্ত হন তাঁর পত্নী। তাকে আটকে রাখার জন্য আগের মতোন আর প্রহরীর প্রয়োজন হয় না। কিছুকাল পরের কথা। পানিহাটি গ্রামে এসেছেন নিত্যানন্দ। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন আপন অভিলাষ। এই পানিহাটিতেই নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ সকল বৈষ্ণবকে 'চিড়াদধি' ভোজন করিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাকে আশীবাদ করে বলেছিলেন, গৌরহরি শীঘ্রই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

আবার ঘরে ফিরলেন রঘুনাথ। মন তার অশান্ত। আবার কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়। তারপর এক রাত্রে তিনি সংসার ত্যাগ করে নীলাচলের পথে ছুটলেন একাদিক্রমে বারো দিন বারো রাত পথে অতিবাহিত করে তিনি পৌঁছলেন নীলাচলে। এখানে রাজপুত্র রঘুনাথের কৃচ্ছ্রসাধন ছিল সত্যিই অবর্ণনীয়। অঙ্গে তাঁর ছিন্ন বস্ত্র, রাত্রে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতেন।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পরে ভিক্ষা করা ছেড়ে দিয়ে, পসারীদের ফেলে দেওয়া দুর্গন্ধময় অন্নে— যা গরুতে পর্যন্ত স্পর্শ করত না।—জীবনধারণ করতেন আর সারাদিন করতেন নাম কীর্তন। ভক্তের এই রকম কৃচ্ছ্রসাধনের সব সংবাদই স্বরূপের মারফত মহাপ্রভু অবগত ছিলেন।

একদিন রাতে হঠাৎ রঘুনাথের আহারের সময় প্রভু স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। রঘুনাথের সেই পর্যুসিত অন্ন থেকে এক গ্রাস মুখে উঠিয়ে নিয়ে বললেন : 'এমন অমৃততুল্য বস্তু তুমি প্রত্যহ গ্রহণ কর, একি অপূর্ব প্রসাদ।' তিনি রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখে প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর সেবিত গোবর্ধন শিলা আর গুঞ্জামালা অর্পণ করলেন রঘুনাথের হাতে।

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলা কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥[১]

সেইদিন থেকে রঘুনাথকে মহাপ্রভু স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে বললেন :

এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥[২]

বৈষ্ণবের করণীয় সম্পর্কে স্বরূপের কাছে শিক্ষালাভ করতে থাকেন রঘুনাথ। তবু তিনি প্রভুর শ্রীমুখ থেকে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন একদিন। অমনি শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয় রঘুনাথকে লক্ষ্য করে সকল বৈষ্ণবদের উদ্দেশে সর্বকালের জন্য কয়েকটি সুন্দর, সরল উপদেশ। ভালো খাবে না, ভালো পরবে না, গ্রাম্য কথা বলবে না, শুনবে না, আর

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ ॥১

রঘুনাথ নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে মহাপ্রভুর শিক্ষা সার্থক করে, বৈষ্ণবদের সামনে চিরকালের জন্য এমন একটি উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গিয়েছেন যার কোন তুলনা হয় না। নীলাচলে দীর্ঘ ষোল বছর তিনি আপন ইষ্টদেবের সেবা করার অধিকার পেয়েছিলেন। মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের গম্ভীরা লীলার তিনিই ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিজের চোখে যা দেখেছিলেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর 'শ্রীগৌরাঙ্গস্তব কল্পবৃক্ষ' নামক গ্রন্থে। এই রঘুনাথের মুখ থেকেই গৌরভগবানের অপ্রাকৃত লীলার অনেক কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল কবিরাজ গোস্বামীর এবং এর কিছু নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে।

মহাপ্রভু যখন অপ্রকট হলেন তখন দেহত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে আসেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামী গণের অনুরোধে তিনি নিবৃত্ত হন। তাঁর শেষ জীবন বড় মধুর ও বেদনাদায়ক। সারা দিন ব্রজের কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে খুঁজে ফিরেছেন বিরহিণী রাধাকে। যখন বার্ধক্যে আর চলবার শক্তি ছিল না, তখনো কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে গিয়ে কেঁদে ডেকেছেন :

হা হা সখি, কি করি উপায় ?
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণবিনু প্রাণ মোর যায়।

॥ উনিশ ॥

হরিদাস—যবন হরিদাস। চৈতন্যলীলায় তাঁর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন : সেই হরিদাসকে নমস্কার করি যাঁর

১ শিক্ষাষ্টক।

বিগত প্রাণ ভূপতিত হলে, মহাপ্রভু নিজ অঙ্কে ধারণ করে নৃত্য করেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে হরিদাসের নির্বাণলাভ গৌরলীলার একটি মর্মস্পর্শী অধ্যায়।

উড়িষ্যা রাজগুরু কাশী মিশ্রের গৃহে প্রভু আছেন। কাছেই একটি নিভৃত উদ্যান। নিজনে ভজনের জন্য তিনি কাশী মিশ্রের কাছে সেই উদ্যানের ভিতরে অবস্থিত ছোট একটি কুটির প্রার্থনা করলেন। তারপর ভক্তশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ হরিদাসকে নিয়ে এলেন ঐ কুটিরে নিজের খুব কাছে। তিনি যখন গৌড়দেশ ত্যাগ করে নীলাচলে চলে এসেছিলেন তখন এই যবন হরিদাসও প্রভুর অনুমতি নিয়ে শান্তিপুর থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে বাস, এ যে কত বড়ো সৌভাগ্য তা জানতেন একমাত্র তিনি। দিনে একবার জগন্নাথ মন্দিরের চূড়াগ্র দর্শন করেন, দিনে একবার প্রভু এসে দর্শন দান করেন তাঁকে। গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে—এঁরা বৎসরান্তে একবার করে নীলাচলে আসতেন এবং কিছুকাল অবস্থান করে আবার ফিরে যেতেন—সারা দিন প্রভুর কত আনন্দে অতিবাহিত হতো। নির্জন কুটিরে বসেই হরিদাস সে-আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন।

সারাদিন নাম করেন হরিদাস।

প্রভুর সেবক গোবিন্দ এসে প্রসাদ দিয়ে যান।

দিনান্তে হরিদাস তা গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে ভেসে ওঠে সেই অতীত জীবনের কথা। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের দিন প্রভু তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—হরিদাস! এই কলিকালে পৃথিবীতে ভক্ত নেই, ভক্তি নেই বলে তোমার যে তীব্র দুঃখ, আচার্য অদ্বৈতের যে ব্যাকুল আহ্বান, সেজন্যই তো আমাকে আবির্ভূত হতে হলো। আরো বলেছিলেন—হরিনাম করার অপরাধে যেদিন মুলুকের যবন অধিপতি তোমাকে কঠোরভাবে নির্যাতন করেছিল, সেদিন কি বৈকুণ্ঠে আমার আসন কেঁপে ওঠেনি? আমি পিঠ পেতে দিয়ে তোমাকে আড়াল করেছিলাম হরিদাস, এই দেখ সেই নিদারুণ নির্যাতনের চিহ্ন আজও রয়েছে আমার শরীরে।

বিচিত্র জীবন তাঁর নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ॥

কৃষ্ণকথার রসাস্বাদনে ভক্তসঙ্গে কেটেছে তাঁর জীবন।

আশৈশব সংসার-বিরক্ত, ভগবানে অনুরক্ত হরিদাস যৌবনে স্বগ্রাম ত্যাগ করে, শান্তিপুরে এক নির্জন গুহায় বসে দিবারাত্র ধ্যান ভজন ও নাম-কীর্তনে মগ্ন থাকতেন, কখনো বা অদ্বৈত আচার্য ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তের সঙ্গসুখে আনন্দলাভ করতেন। নাম-মহামণি কণ্ঠে গেঁথে দিনাতিপাত করতেন হরিদাস তাঁর নির্জন গুহায়। তাঁকে ঘিরে যেন আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল সেদিন এই শান্তিপুরে। বাস করেছেন তিনি কালরূপী মহাসর্পের সঙ্গে। বেনাপোলের জমিদার (এইখানেই বুঢ়ন গ্রামে জন্মেছিলেন হরিদাস) ঐশ্বর্যগর্বে স্ফীত হয়ে কত ভাবে নির্যাতন করেছিলেন ভক্ত হরিদাসকে, দেখিয়েছিলেন কত প্রলোভন তাঁকে। কিন্তু কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র সব সময় রক্ষা করেছে হরিদাসকে। জীবনের প্রতিটি দিন-ক্ষণ-পলকে রাখতেন তিনি কৃষ্ণনামে অলঙ্কৃত করে।

এইসব পূর্ব স্মৃতির রোমন্থন করতেন হরিদাস নীলাচলে তাঁর সেই নির্জন ভজন কুটিরে বসে। আজ জীবন-সায়াহ্নে সেই হরিদাস নির্দিষ্ট সংখ্যা নাম জপ সম্পূর্ণ করতে পারেন না, তাই গোবিন্দের আনা প্রসাদের কণামাত্র স্পর্শ করেই আবার বসেন আসনে, কিন্তু বার্ধক্য-শিথিল দেহ যেন আর ভার বইতে পারে না। সেজন্য তাঁর দুঃখের যেন অবধি নেই।

একদিন। সকালবেলা।

হরিদাসের কুটিরে এসেছেন গৌরহরি।

প্রভুর কী অসীম করুণা! দরদর ধারে অশ্রু ঝরে হরিদাসের দুই নয়নে। প্রভু বললেন, 'হরিদাস! গোবিন্দর মুখে শুনলাম, সংখ্যাজপ সারা হয় না বলে তুমি আহার্য স্পর্শ কর না ?

—হ্যাঁ, প্রভু।

—নামে সিদ্ধ দেহ তোমার, এত জপে এখন আর কি প্রয়োজন ?

—নইলে মন যে মানে না, প্রভু।

—এখন বৃদ্ধ হয়েছ, নামের সংখ্যা কমাও।

হরিদাস সে কথার উত্তর না দিয়ে নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলেন, প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা রাখবে বলো?

—কি প্রার্থনা, হরিদাস?

—আমার মন বলছে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করবে। সেই নিষ্ঠুর লীলা তুমি আমাকে দেখিও না করুণাময়!

—কিন্তু তোমার প্রার্থনাটি কি বলো।

—হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণ ধারণ করে, দুই চক্ষু ভরে তোমার ভুবন-পাবন রূপ দেখে আর মুখে তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করতে করতে আমার প্রাণত্যাগ হোক, এই আমার প্রার্থনা।

অশ্রু সজল হয়ে ওঠে প্রভুর দুই চোখ।

—হরিদাস! তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। কিন্তু তুমি কেন এত নিষ্ঠুর হতে চাও? তোমাদের সকলকে নিয়েই তো আমার সকল আনন্দ। তুমি গেলে আমি কি নিয়ে থাকব বলো?

—তুমি মায়া ছাড়ো। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতেই হবে।

বিষণ্ণ চক্ষে প্রভু চাইলেন হরিদাসের দিকে।

সেই দৃষ্টিতে ছিল যুগপৎ আশ্বাস ও অভয়।

হরিদাস যেন সুস্থ নিরাময় হয়ে উঠলেন।

পরের দিন। বিশিষ্ট কয়েকজন ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু এসে দাঁড়ালেন হরিদাসের অঙ্গনে। তখন হরিদাস সকলের চরণ বন্দনা করলেন। হরিদাসের সামনে এসে প্রভু দর্শন দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরিদাস! কহ সমাচার।' উত্তর হলো, 'প্রভু! যে আজ্ঞা তোমার।'

তারপর হরিদাসকে অঙ্গনের বাইরে এনে শোয়ানো হলো। তখন ভক্তদের নিয়ে তাঁকে ঘিরে আরম্ভ হয় নাম-সংকীর্তন। শুধু কি কীর্তন?

রামানন্দ সার্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥

হরিদাসের গুণ কহিতে হইল পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্বভক্তে বন্দে হরিদাসের চরণ॥[১]

হরিদাসও কম্পিত দক্ষিণ হস্তে ভক্তদের পদধূলি নিয়ে মাথায় রাখেন।

এলো অন্তিম মুহূর্ত।

হরিদাস নিজের সামনে প্রভুকে বসালেন।

বিবশ হয় তাঁর নয়নভৃঙ্গ দুটি প্রভুর রূপকমলের সুধা পান করে। মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে নামের সঙ্গে হরিদাস প্রাণ উৎক্রমণ করলেন। হরিদাসের হলো মহানির্বাণ আপন ইষ্টের সম্মুখে। তারপর?

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্তন করিয়া॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলে কীর্তন করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাঁথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥'
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥
ডোর-কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত করি তাহে শোয়াইল॥[২]

প্রভুর ভক্তকৃত্য কিন্তু এইখানেই শেষ নয়।

তিনি স্বহস্তে বালি দিয়েছিলেন ভক্তের পূত অঙ্গে।

বালুকা শয্যায় শায়িত হরিদাসকে প্রদক্ষিণ করে, কীর্তন করতে করতে এলেন সিংহদ্বারে। হরিকীর্তনে পূর্ণ হয় শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত আকাশ-বাতাস। সন্ন্যাস অনুসারে যিনি নিজের পিতৃপিতামহাদির

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পিণ্ডদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তিনি অস্পৃশ্য যবন হরিদাসের পুত্রকৃত্য করলেন। হরিদাসের তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন করবার জন্য—যে রাজপথে ভিক্ষা দূষণীয় বলেছেন—সেই রাজপথেই ভিক্ষা করতে লাগলেন। সিংহদ্বারে দোকানীদের কাছে আঁচল পেতে প্রসাদ ভিক্ষা করলেন প্রভু। সবাইকে বলেন, 'হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব হবে, ভিক্ষা দাও আমাকে।' প্রসাদ এলো আরো নানা ভক্তদের কাছ থেকে। বৈষ্ণবদের সারি সারি বসিয়ে, চারজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু নিজে পরিবেশন করতে থাকেন। এইভাবে সবাইকে আকণ্ঠ ভোজন করালেন। ভোজনের পর প্রত্যেককে পরালেন মাল্য-চন্দন।

ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন ভক্তবৎসল গৌরহরি। ইতিহাসে অতুলনীয় মর্যাদায় ভূষিত হলেন যবন হরিদাস।

এমন সৌভাগ্য তাঁর আর কোন ভক্তের হয়নি।

মহোৎসব শেষে হরিদাসের মহিমা বর্ণনা করতে করতে রুদ্ধ কণ্ঠে প্রভু যখন বললেন :

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ ॥[১]

তখন সকলের হৃদয়-মন এক বিচিত্রভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

॥ কুড়ি ॥

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥[২]

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গৌরলীলার অতি চিত্তস্পন্দী অধ্যায় 'গম্ভীরা'। মানুষের ভাষার সাধ্য নেই মহাপ্রভুর প্রেমপূত ও সংকীর্তন-শুদ্ধ জীবনের শেষ বারো বছরের বিরহ-উন্মাদের চিত্র আঁকে। শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত সে দিব্য প্রলাপের বর্ণনা করবে কে? সে জিনিস যে অন্য জগতের—ইন্দ্রিয়াতীত জগতের। সেই সর্বদা ভ্রমময় চেষ্টা, সেই প্রলাপ-ভরা আর্তি, শুধু অনুভবের বিষয়, আলোচনার নয়। আবার সকলের পক্ষে সুলভ নয় এই অনুভব। গৌরহরির কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তজনের পক্ষেই শুধু সম্ভব।

নীলাচলে মহাপ্রভুর বাসস্থান ছিল কাশী মিশ্রের বাড়ি। এইখানে তিনি যে কুঠরীতে বাস করতেন সেটি নিতান্ত অপরিসর, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাত্র আট হাত। তাঁর শেষ জীবনে মহাভাবের প্রকাশ নানা-ভাবে হয়েছিল। সিংহদ্বারে গাভীদের মধ্যে পড়ে তিনি অবিকল কূর্মাকৃতি হয়ে যেতেন—হাত পা সব পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হতো। এমন বিচিত্র বিকারের উল্লেখ কোন শাস্ত্রে নেই। কবিরাজ গোস্বামী মর্মস্পর্শী ভাষায় এই বিকারের বর্ণনা করেছেন:

> কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
> সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
> হস্ত-পদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
> সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম রহে স্থানে॥
> হস্তপদশির সব শরীর ভিতরে।
> প্রবিষ্ট হয় কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
> এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
> মনের শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ॥[১]

অন্তরের এই আর্তি বাইরে রূপ পেয়েছিল শ্রীমুখে উচ্চারিত অতি সকরুণ এই ভাষায়:

> কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥
> কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
> ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥[২]

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিহ্বল অন্তরে এইভাবে বিলাপ করবার সময়ে গৌরহরি নিরন্তর পড়তেন অথবা শুনতেন রায়ের নাটক আর চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রচিত পদাবলী। এই উপায়েই প্রশমিত হতো প্রভুর বিরহের সন্তাপ। কিন্তু কি জন্য এই বিরহ-দহন? কি জন্য রাত্রিদিন এই বিরহ-উন্মাদ অবস্থা, আর কি জন্যই বা শ্রীঅঙ্গের প্রতি রোমকূপ থেকে শোণিত ধারা নির্গত হতো? আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল দেহ তাঁর ক্ষণে ক্ষণে কেনই বা শীর্ণ হতো আর ক্ষণে ক্ষণে কেনই বা তা স্ফীত হয়ে উঠতো? কেনই বা তিনি গম্ভীরার ভিতরে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতেন আর ঘরের দেয়ালে মুখ শির ঘষে ঘষে ক্ষত করতেন? গম্ভীরার তিন দিকের দরজায় কপাট দেওয়া থাকে। তাহলে কি করেই বা তিনি বাইরে যান আর কেনই বা যান? বাইরে গিয়ে কখনো সংকুচিত দেহে পড়ে থাকেন সিংহদ্বারে তেলেঙ্গানা গাভীদের মধ্যে, কখনো বা সমুদ্রের জলে। কেনই বা এখানে চটক পর্বত দেখে গিরিগোবর্ধন স্মরণ হয় আর উপবন-উদ্যান দেখে মনে হয় বৃন্দাবন? শুধু মনে হওয়া নয়—এসব দেখে আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠেন—শুধু ক্রন্দন নয়, নাচেন, গান করেন তারপর মূর্চ্ছা যান। কেন এই বিকার, কেন এই বিলাপ?

এক-আধদিন নয়, বারো বছর ধরে নীলাচলে কাশী মিশ্রের রুদ্ধদ্বার ভবনে ক্ষুদ্র গম্ভীরা-প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভু দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই এইভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, দেহবোধ কিছুমাত্র থাকত না। সেবক গোবিন্দ অতি কষ্টে কোন মতে স্নান করিয়ে, জোর করে কোনদিন বা সামান্য কিছু আহার্য মুখে দিতে পারতেন, কোনদিন তাও সম্ভব হতো না। নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শুধু অবিরাম অশ্রুধার।

যুগধর্ম নাম সংকীর্তন-প্রচার আর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীকে যে বিরহ-সন্তাপ ভোগ করতে হয়েছিল সেই জিনিস আস্বাদন করা—গৌর-আবির্ভাবের এই দুটিই মুখ্য হেতু। শুধু বিরহ-সন্তাপ আস্বাদন করা নয়, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর কিরূপ প্রেম ছিল সেইটি জানবার জন্যই এই আবির্ভাব। শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি এই দুটি নিয়েই তো এবারকার লীলা অভিরাম। এবং এই উপলক্ষ্যেই কোন অবতারে

পৃথিবীর জীবকে যা তিনি দান করেন নি, সেই প্রেমভক্তি বিতরণ করতেই নদীয়া-বিহারীর আবির্ভাব। 'এক লীলায় করে প্রভু কার্য পাঁচ-সাত।' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রীরূপ গোস্বামী যে বলেছিলেন 'করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ.' এটাই গৌর অবতারের আসল উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যমুনাতরঙ্গ-কল্লোলিত বৃন্দাবন থেকে সুরধুনী তরঙ্গ-কল্লোলিত নবদ্বীপে যে দিব্য লীলার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সেই ব্রজলীলা আর গৌর-লীলা ভক্তগণের চিরন্তন আস্বাদনের বিষয়. নিছক শুষ্ক আলোচনার বিষয় কথনই নয়।

গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকই শুধু শ্রবণ করতেন এবং আনন্দ পেতেন। তাঁর ভাবানুযায়ী পদ নির্বাচন করে সুকণ্ঠ স্বরূপ দামোদর গান করতেন আর রায় রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি করতেন। ব্রজ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলেছিলেন যে. তাঁদের নিষ্কাম প্রেমের ঋণ তিনি পরিশোধ করতে পারেন নি, তাই তাঁদের কাছে তিনি ঋণী হয়ে রইলেন। সেই ঋণ পরিশোধ করবার মানসেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এই পৃথিবীতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা আরো গভীরের বার্তা জানেন তাঁরা বলেন— শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য আস্বাদন করেন, তা-ই বা কিরূপ এবং ঐ মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীমতী যে আনন্দ ও সুখলাভ করেন. তা-ই বা কিরূপ. এইসব বিষয়ে লুব্ধ হয়েই বৃন্দাবনচন্দ্র (রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে) আবির্ভূত হয়েছিলেন নবদ্বীপচন্দ্ররূপে।

ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অনুরাগ. অভিসার, মিলন, মান. দান ও ক্ষণিক-বিরহ, কিন্তু ব্রজের মাত্র কয়েকটি সুখের দিবস-রজনী মুহূর্তেই বিলীন হয়ে গেল, ঘনঘোর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত আনন্দ। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেল মিলন-গীতি, রচিত হলো জগতের চরমতম বেদনার অশ্রুভারাক্রান্ত, বক্ষ বিদীর্ণকারী মাথুর কাব্য:

মাধব! তুঁহু রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকূল কলরব,
কানু কানু কানু কহি ঝুর!
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত,
সাহসে উঠই না পার;
সখাগণ বেণু, ধেনু সব ছোড়ল
ছোড়ল নগর-বাজার।
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব,
দশদিশি বিরহ হুতাশ,
সহজ যমুনাজল হোয়ল অধিক জল
কহতহি গোবিন্দ দাস।

এই যে বিরহের আর্তি, ইহাই মহাপ্রভুর আস্বাদ্য, ইহাই জগতে তাঁর দান। অনাদিকাল থেকেই জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ, সে তার বিচ্ছেদের বার্তা জানে না, যদি জন্ম-জন্মান্তরের পরম সুকৃতিবলে গুরুকৃষ্ণকৃপায় জীবের চিত্তে এই বিরহের বিন্দুমাত্র স্ফুরণও হয়, তখনই জীব ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয় এবং স্বরূপকে জানার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় তার কণ্ঠ থেকে ওঠে প্রার্থনা—'আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দাও।'

জীবের কাম্য বিরহের অনুভূতি।

জীবের সাধ্যও বিরহের অনুভূতি।

এই বিরহের একবিন্দু অনুভব করেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে সারাটা জীবন কৃষ্ণান্বেষণে কাটাতে হয়েছে, শ্রীমতীর গভীর দুঃখের অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতো। তাঁর চিত্ত ভরে থাকত শ্রীমতীর ভাবেই। অন্তিমকালে ধূলিতলে লুটিয়ে আর্তরবে তিনি যখন 'দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে' বলে ক্রন্দন করতেন তখন তা শ্রবণ করে অতি পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়ে যেত।

সেই বিরহভাব আমরা দেখলাম গৌর-গম্ভীরায়।

বিরহের অসহ্য দহনে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত।

সমস্ত দেহে কদম্বকেশরের মতো পুলক উদ্গম, প্রতি লোমকূপ থেকে ক্ষরিত শোণিতস্রোত, হাত-পা কখন দীর্ঘাকৃতি, কখনো বা কূর্মাকৃতি, জীবনের লক্ষণ আছে কি নেই—শুধু 'অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।' এইভাবেই গম্ভীরায় আমরা প্রত্যক্ষ করলাম গৌরদেহে বিরহের দ্বাদশ দশা। শ্রীমতীর বিরহে ফুটে উঠেছিল দশম দশা। 'কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়'—গম্ভীরার নির্জন কক্ষের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতো এই আর্তি, এই উৎকণ্ঠা। গৌরভগবান দিনরাতের বেশির ভাগ সময় এইভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, দেহবোধ বিন্দুমাত্র থাকত না। বিরহের আর্তিতে এমন সব দিব্য প্রলাপ বলতেন যা শুনে অন্তরঙ্গদের বুক ফেটে যেত। অন্তর্দশায় চোখ মেলবার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকত না। তখন কত কৃষ্ণনাম-কীর্তনে বহুক্ষণ পরে হয়তো বা চেতনা ফিরে পেতেন। চেতনা হলেই বিরহের আর্তিতে আবার কাঁদতে থাকতেন, কখনো বা শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠতেন। রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হতো :

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরিতি অনুরাগ ব্যথা নিয়ে
অনুখন নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।[১]

বিরহের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যখন কৃষ্ণদর্শন হতো, ভাবসম্মিলন ঘটত, তখন প্রভুর মুখ থেকে এইরকম আনন্দোচ্ছ্বাস বের হতো। বিরহের গভীর অমানিশার মধ্যেও যখন মিলন-লগ্নের শুভ অভ্যুদয় হতো তখন অন্তর্লোকের নিগূঢ় আনন্দবার্তা—'না সো রমণ না হাম রমণী'—প্রভুর দিব্য দেহে, প্রফুল্ল বদনে, অরুণাভ নয়নে শতধার

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অশ্রুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো। একমাত্র নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাপাতে এই ছবি অঙ্কিত হওয়া সম্ভব।

গম্ভীরার নির্জন কক্ষে একদিন মহাপ্রভু শয়ন করেছেন। স্বপ্নে দেখলেন, কৃষ্ণ রাসলীলা করছেন। দেখলেন :

ত্রিভঙ্গসুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥[১]

স্বপ্ন ভেঙে যায়। প্রভু তখন রামানন্দ ও স্বরূপের গলা জড়িয়ে হাহাকার করেন।

আর একদিন। সমুদ্রে যাওয়ার পথে আচম্বিতে প্রভুর দৃষ্টিগোচর হয় চটক পর্বত। অমনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন চটক পর্বতকে গিরিগোবর্ধন মনে করে। সেইদিকেই তিনি ছুটে যান বায়ুবেগে। পাছে তাঁর চরণে আঘাত লাগে, সেজন্য সেবক গোবিন্দ তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে চলেন। শুধু গোবিন্দ নন, যে যেখানে ছিলেন—স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত গদাধর—সকলেই ছুটে এলেন সমুদ্রতীরে। প্রভুর গতি তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর

দুই নেত্রে বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িল।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল॥
করঙ্গের জলে করে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লক্ষ্য করে অঙ্গ সংবীজন॥

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥[১]

তারপর উচ্চ সংকীর্তন শোনার পর তাঁর আবিষ্ট ভাব তিরোহিত হয় এবং প্রভু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। কিন্তু বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি এদিক ওদিক তাকালেন; যা দেখতে চান তা দেখতে না পেয়ে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করেন—গিরিগোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে কে নিয়ে এলো? দেখলাম—গোবর্ধনে চড়ে কৃষ্ণ বেণু বাদন করছেন আর তাঁর চারদিকে 'চরে সব ধেনু।' সেই বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে রাধা এলেন। ঠিক এমনি সময়ে তোমরা সব গোলমাল করে, যেখান থেকে ধরে আমাকে এখানে নিয়ে এলে। নিয়ে এলে আমাকে বৃথা দুঃখ দিতে। কিসের দুঃখ? 'পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে।'

এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥[২]

এইভাবে গম্ভীরায় তিনি স্বানুভাবানন্দে ব্রজের বিরহই আস্বাদন করতেন।

এমন দিব্যোন্মাদভাব কে কবে দেখেছে বা শুনেছে?

এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রদিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥[৩]

দিন যায়। প্রভু গম্ভীরায় আছেন। কৃষ্ণ-বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়তে থাকে। দিনরাত করেন উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা। অনুক্ষণ বৃদ্ধি পায় তাঁর রাধা ভাবের আবেশ, কৃষ্ণ প্রেমের আবেশ। আশ্চর্য, এমন অবস্থার মধ্যেও প্রভু তাঁর মায়ের কথা বিস্মৃত হতেন না। প্রতি বৎসর তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাতেন বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জননীকে আশ্বাস দেবার জন্য। সেই সঙ্গে জগন্নাথের উত্তম প্রসাদও পাঠিয়ে

১,২,৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দিতেন। দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তাঁর মাতৃভক্তি কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। এ দৃষ্টান্তও অতুলনীয়।

গম্ভীরায় মহাপ্রভুর মহাভাব প্রেমের চরম পরম অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বৃন্দাবনে গোপীদের মধ্যে এ জিনিস দেখা গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল শ্রীমতীর মধ্যে। তিনি মহাভাবের ঘনীভূত প্রতিমা। নদীয়া-নীলাচলের রাজপথে সেই মহাভাব রত্ন ছড়িয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁরই মধ্যে আমরা মিলন-বিরহের রহস্য প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ, গম্ভীরায় গৌর-সুন্দরের এই হাহাকার ধ্বনি যেন কালের প্রান্তর অতিক্রম করে ভক্তজনের কর্ণে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়। প্রভুর এই গম্ভীরা লীলা মহাভাবের মধুর লীলা। কৃষ্ণপ্রেমের আর্তির শেষ কথা। এই আর্তি যাঁরা অনুভবে আস্বাদন করবেন তাঁদের জীবন ধন্য হবে। গম্ভীরায় কৃষ্ণপ্রেমেরই মহাপ্রকাশ, অন্য কিছু নয়। এই প্রকাশের মধ্যে যুগপৎ মিলনের অমৃতধারা আর বিষের তীব্র জ্বালা বিদ্যমান। তাই তো কবিরাজ গোস্বামী গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করে লিখলেন :

'এইমত রাত্রিদিন, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত॥'[১]

সনাতনকে গৌর ভগবান বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ-মাধুর্য অমৃতের সিন্ধু।' গম্ভীরার নির্জন প্রকোষ্ঠে বারো বছর ধরে দিবারাত্র অত্যদ্ভুত বিরহ বিকারের ভেতর দিয়ে তাঁর এই বিচিত্র অনুভূতি—'কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সিন্ধু'—অভিব্যক্ত হয়েছিল। বৃন্দাবনচন্দ্রের নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-সীমা দেখালেন নবদ্বীপচন্দ্র স্বয়ং আস্বাদন করে। গৌরলীলার নিগূঢ় মর্মকথা এই।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

॥ একুশ ॥

গৌর-প্রতিভার অপূর্ব দান শিক্ষাষ্টক।

নীলাচলে আপন ভক্তজনদের প্রভু নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকে তার নিদর্শন আছে :

১. চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥

২. নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

৩. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

৪. ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

৫. অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলী সদৃশং বিচিন্তয়॥

৬. নয়নং গলদশ্রু ধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

৭. যুগায়িতং নিমেষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

৮ আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনাম্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

মহাপ্রভুর রচনা বলতে আমরা পেয়েছি মাত্র এই আটটি শ্লোক। আটটি বৈদূর্যমণি। কী ভাবগভীর এই শ্লোকষ্টক! তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তা আর অনুভব রূপায়িত হয়েছে এই চিত্তস্পর্শী শ্লোক কয়টিতে। প্রথম শ্লোকটিতে জয়যুক্ত হয়েছে হরিসংকীর্তন। কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সবভক্তি-সাধন উদ্গম্ ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গন্ প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥[১]

কীর্তন-যজ্ঞেশ্বর পূর্বেও বহুবার নারদীয় ভক্তিসূত্রের উল্লেখ করে, নিজে প্রণালী দেখিয়ে দিয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে ভুবনমঙ্গল 'হরের্নাম' কীর্তন করিয়েছেন, কণ্ঠস্থ করিয়েছেন। কলিতে ভক্তি তথা নাম সাধন ভিন্ন যে জীবের গতি নেই, তা নিয়ে বার বার বলেছেন। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে ভাগ্যবান তপন মিশ্রকে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের উপদেশচ্ছলে হরিনাম সংকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রভু বলেছিলেন:

কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ ॥
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥[১]

নামের মধ্যেই সর্বশক্তি আছে—একথা স্বয়ং গৌরহরির। তাই তো তিনি নামের বিরহ ভোগ করেছেন। শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে এই বিরহের আস্বাদন। ভগবান্ বহুভাবে নিজের নাম প্রচার করেছেন; সেইসব নামে ন্যস্ত করেছেন নিজের সর্বশক্তি। সেই নামের স্মরণ বিষয়ে দেশ-কাল সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধই নেই। জীবের পরম কাম্য প্রেমধন লাভ হয় শুধু নামেরই আশ্রয়ে, জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ ইহাই। কিন্তু কিভাবে সেই নাম নিলে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় তার লক্ষণ তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন। কবিরাজ গোস্বামী এর অনুবাদে লিখেছেন:

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম॥
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥[২]

গৌর-লীলায় বোধ করি এর একমাত্র দৃষ্টান্ত বেনাপোলের যবন হরিদাস। তৃণাদপি সুনীচ হরিদাস, কিন্তু প্রভু জানেন সহিষ্ণুতার মূর্ত বিগ্রহ হরিদাস—শুধু বৃক্ষবৎ সহিষ্ণু নন তিনি, বিরাট বনস্পতি-তুল্য সহিষ্ণু এবং ছায়া-শীতল। তাই তো নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু ডাকলেন—'হরিদাস! কোথায় তুমি, একবার এসে আমাকে দর্শন কর।' প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, 'জীবে সম্মান দিবে।

১,২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি-কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যেই কৃষ্ণ আছেন, কাজেই শুধু জীবে দয়া নয়, জীবের সেবা করবে, জীবকে সম্মান দেবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে। ভক্ত হরিদাসের জীবনে প্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সার্থক হয়েছে।

শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'হে জগদীশ! আমি তোমার চরণে ধন কামনা করি না, জন কামনা করি না, সুন্দরী পত্নী কিংবা পাণ্ডিত্য—এসব কিছুই কামনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'

রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গোপীনাথ, গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপ—এঁর প্রত্যেকেই কত ঐশ্বর্যবান, বিত্তবান ও বিদ্বান ছিলেন। ঐশ্বর্য ও আরামের মোহ এঁদের কাউকে বাধা দিতে পারে নি, সংসার তার শত বাহুডোরেও তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে নি। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্কাম অহৈতুকী ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। মহাপ্রভুর নির্দেশে এঁরা প্রত্যেকেই বৈষ্ণবের যে তিনটি প্রধান কর্তব্য—নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন ও জীবে দয়া—তা-ই একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করতেন। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি নয়, কৃষ্ণপ্রীতিই ছিল এঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'—প্রভুর শিক্ষার গুণে এই বিশ্বাস এঁদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

জীবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আশায় প্রভু দুটি ভাব—জীবভাব আর ভক্তভাব অঙ্গীকার করে, পঞ্চম শ্লোকে দাস্যভক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী এর ভাবানুবাদে লিখেছেন:

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্নবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥[১]

—হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! আমি জীব স্বরূপতঃ তোমার নিত্যদাস,

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কিন্তু মায়া দ্বারা কবলিত হয়ে আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার চরণতলের ধূলি করে নাও, দাও, আমাকে তোমার সেবার অধিকার। 'আমার মাথা নত করে দাও হে, তোমার চরণ ধূলার তলে'—এ যুগের কবিশ্রেষ্ঠের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে এই একই প্রার্থনা। এ প্রার্থনা জীবের চিরন্তন। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই এই প্রার্থনার চরম সার্থকতা।

দাস্য-ভক্তির প্রার্থনা করতে করতেই ভক্তভাবে প্রভুর মনে হলো, তাঁর তো দাস্য-ভক্তি নেই—নেই কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা! অমনি অধীর চিত্তে কাঁদতে কাঁদতে প্রভু ডাকতে থাকেন—হে ভগবান্! এমন দিন আমার কবে আসবে, যখন তোমার নাম করতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন দুটি আপ্লুত হবে, গদ্‌গদ বাক্যে রুদ্ধ হবে বদন আর সমস্ত শরীরে জাগবে পুলকের শিহরণ। শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকের মূল কথা—'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।'

জীবভাবে, ভক্তভাবে দাস্য প্রার্থনা করতে করতেই প্রভুর চিত্তে প্রেম জেগে ওঠে। তিনি স্বয়ং প্রেমময়, মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে তাঁর আবির্ভাব। তবু জীবের শিক্ষার জন্য তাঁকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে ভক্তভাব। সর্ব রসের মূলাধার দাস্য-ভক্তিই সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলে অহৈতুকী প্রেমের পথে—যার মধ্যে মিলে মিশে আছে সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস।

ব্রজগোপীদের বিরহের সুতীব্র আর্তি মহাপ্রভুর অন্তরে কি রকম আঘাত করেছিল, তা-ই অভিব্যক্ত হয়েছে শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে। কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিরহে অধীর হয়ে প্রলাপ বলতে থাকেন। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রভু নিজেকে রাধা ভেবে বলছেন :

গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥[১]

শুধু তাই নয়। গোবিন্দবিরহে এক নিমেষ কাল এক যুগের মতো

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিলম্বিত হয়েছে, কৃষ্ণ বিনা সমস্ত জগৎ শূন্য বলে বোধ হয়েছে। প্রভুর বাহ্যদশা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল, সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায় ভক্ত-ভাবও। গম্ভীরায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর যা প্রত্যক্ষ করলেন তা আর কিছুই নয় গৌরভগবানের ভিতরে-বাহিরে শুধুই শ্রীমতীর ভাব, শুধুই কৃষ্ণবিরহ।

তাঁরা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে অনুভব করলেন যে, কোন্ এক অলক্ষিত মুহূর্তে শ্রীমতী রাধা, নিজের অঙ্গকান্তি থেকে স্বর্ণদ্যুতি নিয়ে বিলেপন করেছেন নিকষ কৃষ্ণপাথরে, আপন অন্তরের ভাব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিগ্রহের প্রাণ, তাই কৃষ্ণ আজ হয়েছেন রাধারস-জারিত তনুমন গৌর। এই হলো মহাপ্রভুর নিগূঢ় তত্ত্ব। এই রূপ একদিন মাত্র ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মতো দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের। তিনি দেখেছিলেন, 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।'

শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকটি শ্রীমতীর উক্তি। সখীদের সম্বোধন করে রাধা বলছেন, তিনি কৃষ্ণের পদদাসী, তাঁকে আলিঙ্গন করে বুকে নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মাহতই করুন, অথবা অন্য গোপীদের সঙ্গে বিহারই করুন, তিনি যাই করুন না কেন, তিনিই তাঁর প্রাণনাথ, প্রাণনাথ ভিন্ন আর কেউ নন। তিনি কৃষ্ণ সুখেই সুখী।' তাঁর তনু-মন-প্রাণ সবই কৃষ্ণে সমর্পিত।

না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুখ মোর সুখবর্য ॥[১]

কতখানি কৃষ্ণগত প্রাণ হলে বলা যায়—কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ-সেবাই আমার ধ্যান, কৃষ্ণ-সুখে আমার সুখ—গৌর-গম্ভীরায় আমরা তাই প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। ইহাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম।

---

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বাঞ্ছা পূর্তির জন্যই গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য জীবভাব অঙ্গীকার করেছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য ও প্রেমধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর অবতরণের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণ ভগবান হয়েও, ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক নিজে আচরণ করে ভক্তি প্রচার করে গিয়েছেন।

তাঁর লীলা দু' রকম :

বহিরঙ্গ লৈয়া করে নাম-সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ লৈয়া করে রস-আস্বাদন ॥[১]

মহাপ্রভু রায়রামানন্দের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করে তাঁকে দিয়ে বিবৃত করেছেন রস-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধা-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি। সনাতন-শিক্ষার ভিতর দিয়ে কলির বহির্মুখ ও মায়ামুগ্ধ জীবকে নির্দেশ করেছেন শ্রেয়ের পথ। শ্রীরূপ গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার পূর্বক পুনঃপ্রচার করেছেন বৃন্দাবনের বিলুপ্ত মহিমা। এইভাবে স্বীয় পরিকরগণের মাধ্যমে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপরূপ সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন আর স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আটটি মাত্র শ্লোকে কীর্তন করেছেন নাম-মাহাত্ম্য ও অপ্রাকৃত প্রেমের চিরন্তন গৌরব।

করুণার অবতার গৌরভগবানের চরিত্রে যুগপৎ কুসুমের পেলবতা আর বজ্রের কঠোরতার সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর জীবনে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রবর্তক মহাপ্রভু। স্বরূপ ও রামানন্দকে তিনি বলেছেন :

নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আস্বাদন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥[২]

শিক্ষাষ্টকের প্রথম দুটি শ্লোকে তাই তিনি নামের মহিমা কীর্তন

১,২ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

করেছেন আর কিভাবে এই নাম-কীর্তন করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রেখেছেন তৃতীয় শ্লোকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—জ্ঞানীর নিকট যিনি পরব্রহ্ম বা বৃহত্তম বস্তু, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান। ভক্তগণ এই অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবানেরই নামকীর্তন করেন। তাঁরা যাগযজ্ঞাদি কর্মের পথ, বিচারমূলক জ্ঞানের পথ অথবা কঠোর যোগের পথ পরিত্যাগ করে, একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করেন এবং অবশেষে ভগবানের কৃপা লাভ করে ধন্য হন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি সনাতন-শিক্ষার ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাই জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই আছে কৃষ্ণসেবার মহান অধিকার। সংসারে তিনিই ধন্য, যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলে জানেন আর দাস্যভাবে যিনি নিয়ত ভগবানের উপাসনা করেন। কৃষ্ণসেবার এই মহান অধিকার রয়েছে শুধু মানুষের। এই মহান মর্যাদা মানুষকে দান করে গিয়েছেন গৌর-ভগবান। গৌরলীলার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

এই লীলায় আরো একটি তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।
ভক্ত ও ভগবান দুয়ে এক, একে দুই।
সূর্য ও সূর্য কিরণ যেমন অবিচ্ছেদ্য।
কেবল 'লীলা আস্বাদিতে হয় দুইরূপ।'

ভক্ত ও ভগবান এক অচিন্ত্য তত্ত্ব। যুগপৎ ভেদও বটে, অভেদও বটে। ভক্ত ও ভগবানের এই নিগূঢ় তত্ত্বকথা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে। ভক্ত-ভগবানের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। সেই কারণেই 'ভক্তরূপেন লোভাৎ।' ভক্ত শিরোমণি শ্রীমতী রাধার ভাব অঙ্গীকার করেই রাধা-গোবিন্দ মিলিত বিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তাঁর ভজনই কলিতে জীবের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব মহাজনদের তাই সিদ্ধান্ত: 'অবতার সার গোরা অবতার।'

গৌরলীলার আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রু ও ভাবের ঐশ্বর্যই লক্ষ লক্ষ লোককে প্রেমভক্তির উপাসনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের মতো তাঁকে কখনো বক্তৃতা করতে হয়নি, এমন কি দশজনের মধ্যে দশটা উপদেশও দিতে হয়নি।

গৌরলীলার নিপুণ ব্যাখ্যাকার শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত মহাপ্রভুর সহস্র নাম-স্তোত্র থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে গ্রন্থ শেষ করছি:

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশ্বম্ভর জগদ্‌গুরো।
জগৎস্বামী জগদ্ভর্তা জগদ্বন্ধুর্জগন্ময়ঃ॥
জগদ্ধাতা বিধাতা চ কারণং করুণাময়ঃ।
কারুণ্যকরুণাসিন্ধো দানবন্ধো দয়ানিধে॥
